Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের আদিবাসী কবিতায় উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হিমেল বরকত
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.4
Pages	৯১-১২৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের আদিবাসী কবিতায় উত্তর-ঔপনিবেশিক চে

Check for updates

হিমেল বরকত*

১

ইউরোপে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে পুঁজির সম্প্রসারণ, মুনাফা অর্জন, বাজার-দখল ইত্যাদি আয়োজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত উপনিবেশবাদ। অবশ্য কেবল অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই উপনিবেশবাদের পরিধি নয়, শোষণের স্বার্থে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, সামরিক-বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার এবং উপনিবেশিত জাতি বা রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত। উপনিবেশবাদের সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিদেশি শাসক শ্রেণির মধ্যে নির্মিত হয় ক্ষতদায়ক এক মর্মান্তিক সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে ফ্রাঞ্জ ফানো বলেন :

> উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তাধীনে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোন এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়। (ফ্রাঞ্জ, ২০০৬ : ২৮)

ফানো ক্যারিবীয় অঞ্চলের স্থানীয়দের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সেখানে কার্নিভালের সময়ে কালো দাসেরা সাদা মুখোশ ব্যবহারের সুযোগ পেত। এবং এই সুযোগটি তারা উৎফুল্ল চিত্তে ব্যবহার করত। ফানো বলেন, কালো দাসদের দ্বারা সাদা মুখোশ পরে সাদা হয়ে ওঠার এই প্রবণতা অধিকাংশ কালো মানুষের মধ্যে প্রবল। তারা কেবলই তাদের সাদা প্রভুদের মতো হয়ে উঠতে চায়। (Frantz, 1967 : 13) উপনিবেশিতের মনের এ পতন ঔপনিবেশিক শাসনেরই প্রত্যক্ষ ফল। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্যবাদী চারিত্র্যই উপনিবেশিতের মনে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ টান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি হীনম্মন্যবোধ।

ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের অন্তরালেও মূল লক্ষ্য হিসেবে জাগ্রত থাকে প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও অনুগত এক শ্রেণির সৃষ্টি — যারা ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হবে। ভারতবর্ষে উনিশ শতকে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ইংরেজদের এই পরিকল্পনারই ফল। উপনিবেশবাদের এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো —

> সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করছে সেটা হল সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হল মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

> ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা।... নিজের সৃষ্ট এই পোড়ো ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে উপস্থাপন করে থাকে ত্রাতার আদলে এবং দাবি করতে থাকে অধীনস্থরা সমস্বরে গাইবে : চৌর্যবৃত্তি হল পবিত্র। (নগুগি, ২০১০ : ১৫)

এভাবে, আধিপত্যবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে বাস্তব ভিত্তি প্রদান করে উপনিবেশবাদ। ইউরো-উপনিবেশবাদ প্রায় চারশ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পরাধীন রাষ্ট্রগুলোতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে শোষণের পাশাপাশি তাদের সম্ভাবনাকে অবদমিত করেছে। উনিশ বা বিশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের এই অবদমন থেকে খুব কম জাতি বা রাষ্ট্রই মুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, অধিগত ওই সব উপনিবেশের সম্পদ ও সম্ভাবনা শোষণ করেই মেট্রোপলগুলো নিজেদের সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেছে। উপনিবেশবাদ বিশ্বব্যাপী কেবল শোষণ-আধিপত্যই বিস্তার করেনি, অর্থনৈতিক বিভাজন ও রাজনৈতিক মেরুকরণও এর পরিকল্পিত সৃষ্টি। স্থানীয়দের ভেতর অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদ, সম্প্রদায়গত বিভাজন, জাতীয়তাবোধের বিভক্তি সৃষ্টি মূলত ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও তা নির্বিরোধ করারই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে উপনিবেশিতরা হারায় আত্মপরিচয়। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ধারণার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় মেরুপ্রতিম বিচ্ছিন্নতা। সেই সঙ্গে পারস্পরিক হানাহানি, সম্প্রদায়গত বিক্ষোভ, রক্তপাত। সবশেষে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ওই দেশগুলোতে অবশিষ্ট থাকে কেবল দারিদ্র্য, সহিংসতা আর 'তৃতীয় বিশ্ব' নামক পশ্চাৎপদতার অভিধা।

অপরদিকে, উপনিবেশবাদের উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিরোধজাত চৈতন্যের নাম উত্তর-উপনিবেশবাদ। বস্তুত, উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য হল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধী জ্ঞানভাষ্য। ঔপনিবেশিক প্রভাবের ক্ষতিসমূহ সনাক্তকরণ, সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং বি-উপনিবেশিকীকরণের মাধ্যমে নিজস্ব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পুনর্গঠন এই চৈতন্যের সারাৎসার। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী অবস্থাকে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা বললে এর তাৎপর্য যথার্থ রূপ পায় না। মূলত উপনিবেশের প্রভাব নির্বীজ করার লক্ষ্যে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চর্চা ও আন্দোলনের নাম উত্তর-ঔপনিবেশিকতা। ঔপনিবেশিক শাসকদের উদ্যোগে-সমর্থনে পরিচালিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার কারণে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, ভাবনার জগৎ ও তার চর্চার ক্ষেত্রে যেসব নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত ও দূর করা এবং আধিপত্যমুক্ত জ্ঞানচর্চার পথ খুলে দেওয়ার তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও উপায় হল উত্তর-উপনিবেশবাদ।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্যের প্রধান লক্ষ্য অন্তর্গত সমস্ত ছদ্মবেশের উন্মোচন। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে অর্থাৎ সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে তার বিপরীতে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে

নৈঃশব্দ্যের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা এর লক্ষ্য। (ফকরুল, ২০০৭ : ভূমিকা) ঔপনিবেশিক প্রতাপ ও আধিপত্যকে অস্বীকার বা বিনির্মাণ করার মধ্যে তাই ফুটে ওঠে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের রাজনীতি। এই সূত্রে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ বহুমুখী প্রতিসন্দর্ভ তৈরি করতে চায়, যেখানে চির উপেক্ষিত ব্রাত্যজন ও নারীর নিরুচ্চার উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের আধিপত্যের জোরে যে বাস্তব নির্মাণ করে তাতে যতটা সত্য তার চেয়ে সত্যভ্রম বেশি। উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে মুখোশ থেকে মুখকে এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। (তপোধীর, ২০০৭ : ১৪১)

উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্যের শব্দগত অভিধা থেকে মনে হতে পারে, এটি উপনিবেশ-উত্তর বা উপনিবেশ-পরবর্তী চৈতন্যের বাহক। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই চৈতন্যের সূচনা। অধিকৃত জনগোষ্ঠী তাদের সুবিধাজনক মাধ্যম ও কায়দায় উপনিবেশের প্রভাব প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ যাবৎ প্রায় সব উপনিবেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞানজগৎ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন চর্চায় উপনিবেশি প্রথা-পদ্ধতির উপস্থিতি এখনো অম্লান। কাজেই বলা উচিত, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উত্তর-উপনিবেশি প্রতিরোধ-চেষ্টার সূচনা এবং এখনো তা চলছে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশগুলোর বেহাল উপনিবেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই সত্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের আরেক উপনিবেশে। পাশাপাশি, সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর নব্য উপনিবেশি আগ্রাসনও ছিল ক্রিয়াশীল। ফলে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক হামলা, অন্যদিকে বিশ্বের নব্য ঔপনিবেশিক আধিপত্য — এই দ্বিমুখী আগ্রাসনের ভেতর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে এগুতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশও যথার্থ মুক্তি পায়নি ঔপনিবেশিক রাহু থেকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনসৃষ্ট মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত রাজনীতিবিদ, আমলা, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী চক্রের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় এদেশের অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে অক্ষুণ্নমাত্রায় প্রবাহিত হয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভাব ও পরানুকরণের লক্ষণসমূহ। শ্রেণিস্বার্থের প্রয়োজনে প্রতিশ্রুত 'সমাজতন্ত্রে'র বদলে রাষ্ট্রব্যবস্থা কবলিত হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা। এর সমান্তরালে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের হস্তক্ষেপে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাক্তন উপনিবেশিত রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও বন্দি হয়েছে নব্য ঔপনিবেশিক আধিপত্য-বলয়ে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসনের সম্প্রসারণ ও নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিভিন্ন মাত্রার এই পটভূমি বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রেও জোরালো প্রভাব বিস্তার করে আছে।

ঔপনিবেশিক চারিত্র্য ভেতরে-ভেতরে কী তীব্রভাবে স্বাধীন বাংলাদেশও লালন করছে, তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই, যখন এদেশের অন্য জাতিগোষ্ঠীর কবিতা (তা বাংলায়

রচিত হলেও) 'বাংলাদেশের কবিতা'-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। চাকমা, মারমা, তন্‌চংগ্যা, মণিপুরী, গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্য এভাবেই উপেক্ষার দাগ নিয়ে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যধারা হিসেবে গড়ে উঠেছে। 'বাংলাদেশের কবিতা'-র যাবতীয় সংকলনে চোখ রাখলেই আমরা এসব প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী কবিদের অনুপস্থিতি লক্ষ করব। উপেক্ষা ও বর্জনের এই বাস্তবতা বাংলাদেশের কাব্যধারাকে যেমন খণ্ডিত অবয়ব দান করেছে, তেমনি বাংলাদেশের কবিতা সংক্রান্ত প্রায় সকল আলোচনাই সেই ত্রুটির অন্তর্গত। ঔপনিবেশিক শক্তি কেন্দ্র এবং প্রান্তের যে সম্পর্কমাত্রা আরোপ করতে চায় এবং প্রতিষ্ঠা করে, বাংলাদেশে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কাব্যক্ষেত্রেও এই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে, বাঙালি ক্ষমতায়নের শক্তিতে বলীয়ান 'মূলধারা' বা 'মূলস্রোত' নামের কাব্যধারাটি আজ নেতৃত্বের চূড়ায় এবং বাংলাদেশে রচিত অন্যান্য জাতির কাব্য 'অপর' বা অপাঙ্‌ক্তেয় হিসেবে গণ্য।

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। অবশ্য, ভিন্ন-ভিন্ন সূত্র এই সংখ্যার বিভিন্নতা উপস্থাপন করেছে। কারো মতে ২৭টি, কারো মতে ৪১টি, কারো মতে বা ৫১টি। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্যের পরিচয় এভাবেও মুদ্রিত হয়ে ওঠে সংখ্যার ভিন্ন-ভিন্ন দোদুল্যমানতায়। আদিবাসীদের যথার্থ সংখ্যা যে-রাষ্ট্রে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, সেখানে এসব আদিবাসীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোযোগের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র লড়াইয়ে বিপন্ন বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে তাই হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ভাষা-বর্ণমালা-সাহিত্য।

বাংলাদেশের অন্য জাতিগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের কবিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৃহৎ ও আধিপত্যশীল জাতিগোষ্ঠী বাঙালি 'মূলধারা'র কবিতার প্রভাবে ও প্রতাপে আদিবাসী কাব্যের ঐতিহ্য ও নিজস্বতা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যের প্রভাব তেমন না-থাকলেও লিখিত কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রভাব আশঙ্কাজনক মাত্রায় সংক্রামিত হচ্ছে। ভাষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী কবি বাংলা ভাষাকে বেছে নিচ্ছেন। উপেক্ষার যন্ত্রণা, কবি-স্বীকৃতির অভাব কিংবা নিজের রচনাকে বৃহৎ সংখ্যক পাঠকের সামনে উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা — যে কারণেই হোক, নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রবণতা ইতিবাচক চিহ্নের স্মারক নয়। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু ভাষার সাহিত্যের এভাবেই মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তীকালে এই দুই প্রাক্তন উপনিবেশিত মহাদেশের অনেক কবি ইংরেজি বা ফরাসি ভাষা ত্যাগ করে নিজ ভাষাতেই কাব্য রচনায় নিজেদের সমর্পিত করেছেন। এমনই একজন নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (যিনি নিজের নামটিও বদলে নিয়েছিলেন)। কিন্তু বাংলাদেশে বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসী কবি নিজ ভাষা ছেড়ে বাংলায় কাব্যচর্চার যে-ধারা তৈরি করেছেন, তা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার নামান্তর।

অবশ্য, এখনো বাংলাদেশে অন্য জাতিগোষ্ঠীর অনেক কবি স্বভাষাতেই কবিতা লিখছেন, তাঁদের কবিতায় আদিবাসী জীবন-ঐতিহ্য-প্রকৃতির স্পর্শ যেমন মূর্ত, তেমনি ধ্বনিময়তায়, উপস্থাপনশৈলীর নিজস্বতায় তা স্বতন্ত্র ও বাঙ্ময়। আবার, বাংলা ভাষায়

রচিত অনেক আদিবাসী কবিতায়ও স্ব-স্ব ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার, ধর্ম, প্রকৃতি-বন্দনার উপস্থাপন লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে, বাংলাদেশ-পর্বে রাষ্ট্রীয় নানা বঞ্চনা, নির্যাতন, উপেক্ষার বিরুদ্ধে সরব উচ্চারণের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মন্ত্র। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের আদিবাসী কবিতার এই সংক্ষুব্ধ চৈতন্যের পরিচয় ও স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। আলোচনায় ভিন্ন-ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কবিতা নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণজাত ব্যাপকতা পরিহার করার লক্ষ্যে এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার প্রবণতাসমূহের সংহত প্রকাশের স্বার্থে ঢালাওভাবে 'আদিবাসী' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

২

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষের অন্য জাতিগোষ্ঠীর মতো আদিবাসীরাও শিকার হয় শোষণ ও প্রান্তিকীকরণের। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে আদিবাসীদের সংগ্রাম বিশেষ করে সিধু-কানু-বিরসার লড়াই জাতীয় আন্দোলনেরই স্মারক। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সে-কালে চালিয়েছে নানা তৎপরতা।

> ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলে চলে যাবার পরেও চাক্মা রাজা এবং বোমাং রাজার শাসনাধীন পার্বত্য অঞ্চল স্বাধীন ছিল। ১৭৭৭ সালে ইংরেজরা পরপর দু'বার অভিযান চালিয়েও এই অঞ্চল দখল করতে পারেনি। চাক্মা রাজা শেরদৌলত খান, জান বকস্ খান ও রুনু খানের নেতৃত্বে পাহাড়িরা কোম্পানির শাসনের বিরোধিতা করেন। ইংরেজরা ১৭৮৩-৮৪-৮৫ সালে পর পর অভিযান পরিচালনা করেন। চাকমা রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য পাহাড়ীদের ওপর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। (বীরকুমার, ২০০৩ : ৬৫)।

এমনকি সমতলবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দৈনন্দিন দ্রব্য সংগ্রহের সুযোগ থেকেও পাহাড়িদের বঞ্চিত করা হয়। জান বক্স খান নিরুপায় হয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে নিয়মিত রাজস্ব দেবার শর্তে কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হন।

ব্রিটিশ শাসকদের পুঁজি-সংগ্রহের মূল হাতিয়ার ছিল প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আদায়। এই লক্ষ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ শক্তি পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী জুম-চাষকে আদিম অভিহিত করে এই চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কেননা, জুম-চাষের জন্য একটা জমি অনেক বছর ফেলে রাখতে হয়; ফেলে রাখার কারণে রাজস্ব-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লাভবান হবার সম্ভাবনা কমে যায়। ফলে পার্বত্যবাসীদের হালচাষের দিকে মনোযোগী করার চেষ্টা চালায় শাসকগোষ্ঠী। এছাড়া, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি পাহাড়িদের স্থান-পরিবর্তনের স্বভাবকেও মেনে নিতে চায়নি; কারণ এতেও টোল আদায় বিঘ্নিত হয়। (আমেনা, ১৯৯৯ : ৪৩)

পাকিস্তানপর্বেও আদিবাসীরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও প্রান্তিকীকরণের অভিজ্ঞতায় জারিত। এ সময় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সবচেয়ে মর্মান্তিক স্মৃতি 'কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প'। পাহাড়িদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ইউএসএইডের ঋণে নির্মিত এই বাঁধ প্রকল্প পাহাড়ি অঞ্চলে নিমজ্জিত করেছে হাজার-হাজার আদিবাসী পরিবারকে। '১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে তার পরিণতিতে ৯৯ হাজার ৯শ' ৭৭ জন বাস্তু ও

জমিহারা হয়ে পড়েন।... বাঁধের ফলে মোট চাষযোগ্য জমির ৫৬.০৬% অর্থাৎ ৫৪ হাজার একর ভালো আবাদি জমি প্লাবিত হয়।' (প্রদীপ্ত, ১৯৯৬ : ৩৫) এছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হলেও কাপ্তাই বাঁধের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও থেকে বিদ্যুৎ সংযোগহীন। ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার কথা থাকলেও তাদের দেয়া হয় ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ক্ষতিপূরণের টাকার বেশির ভাগই আবার আত্মসাৎ করে পাকিস্তানি আমলারা। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের আবেদন জানালে বলা হয়, 'উপ-জাতীদের জন্য এত সাহায্যের দরকার নেই'। (সুগম, ২০০৯ : ৪০)

আদিবাসী-পীড়নের উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতা স্বাধীন বাংলাদেশে খুলে দিয়েছে আরো উৎসমুখ। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' এই সাংবিধানিক ঘোষণার প্রতিবাদে জাতীয় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্থাপিত বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য :

> আমি যে স্থান থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষার বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতোপ্রতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়ে আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ... কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি।
>
> আমার সদস্য সদস্যা ভাই বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধান আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়...। (সঞ্জীব, ২০০৪ : ৭১-৭৩)

বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কালক্রমে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মীয় কর্তৃত্বও। ১৯৭৮ সালে সংবিধানের শুরুতে যুক্ত হয় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে) এবং আরো সন্নিবেশিত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধানের চারিত্র্যের এই ইসলামিকরণ আরো পূর্ণাঙ্গতা পায় ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে। সংশোধনীতে লিপিবদ্ধ হয় — 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' এভাবে সংবিধানের ইসলামিকরণের ফলে আদিবাসী জাতিসত্তার ধর্মও হয়ে পড়ে প্রান্তিক।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন সুসংহত করার লক্ষ্যে উপনিবেশিত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও নৃবৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তথ্য-সংগ্রহে প্রথমাবস্থায় সক্রিয় ছিল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পরিব্রাজক/গবেষক এবং মিশনারি কর্তৃপক্ষ। তথ্য এবং তত্ত্বের এই বিশাল সংগ্রহ থেকে দেখা যায়, ইংরেজরা 'ইন্ডিজেনাস'কে রাষ্ট্র, প্রশাসন এমনকি মূলধারার নেটিভদের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখিয়েছে। এ ধরনের পরিবেশন 'ইন্ডিজেনাস'কে শ্রেণীকরণ ও বর্গীকরণ করতে সচেষ্ট

হয়েছে এবং এর ফলে একটি অখণ্ড 'ট্রাইবাল' ক্যাটাগরি নির্মিত হয়েছে — যা বিভিন্ন 'ইন্ডিজেনাস' গ্রুপের মধ্যকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ট্রাইবাল'কে এমনভাবে দেখানো হয় যা বাস্তব জীবনে সামান্যই অর্থ বহন করে। যেমন বলা হয়েছে, এরা 'সরল' 'অনুন্নত' 'বিচ্ছিন্ন' কিংবা এদের রয়েছে 'বিচিত্র আর্থ-রাজনৈতিক বা বিশ্বাস-ব্যবস্থা এবং মানব বিবর্তনের এক প্রাচীন পর্যায়ে' এরা রয়ে গেছে। (মাহমুদুল ও সাঈদ, ২০০৯ : ৫৬-৫৭) এই ঔপনিবেশিক শ্রেণীকরণ, বর্গীকরণ ও অপরতার নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ভেতরও সংক্রামিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের বাঙালিরা সভ্য 'নিজে'র বিপরীতে আদিবাসীদের 'অসভ্য' 'আদিম' রূপে চিহ্নিত করে নিয়েছে। তাদের জাতিসত্তাবাদী রাজনীতিও বাঙালির কাছে পরিস্ফুট হয়েছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডরূপে — 'সন্ত্রাসীদের কপটতা এখানেই শেষ নয়। তারা তাদের জাতি সত্বার [সত্তার] সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাচ্ছে। অথচ তারা কোন জাতি নয়। তাদের দাদা-প্রভু ব্রিটিশ সরকারই তাদেরকে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে গেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষরাই তা মেনে নিয়েছিলেন।... আমাদের সম্পদ দিয়ে জঙ্গলবাসী লারমাদের শিক্ষিত ও সম্পদশালী করার ফলেই আজ তারা দেশদ্রোহীতায় নেমেছে। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে?' (জয়নাল, ১৯৯৭ : ১০) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যেভাবে সন্ত্রাসমূলক আচরণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, বাঙালিরাও ঠিক একইভাবে আদিবাসীদের অধিকার-দাবিকে 'সন্ত্রাসী কপটতা' ও 'বিশ্বাসঘাতকতা' রূপে মূল্যায়নে সচেষ্ট।

পাশাপাশি, পাহাড়িদের মাঝে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি ভূমিহীনদের প্রবেশ করিয়ে যে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, খুন-ধর্ষণ-অপহরণের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে — তা ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর উপর বাঙালি এবং সেনাসদস্যরা '৭১-পরবর্তী সময়ে চালিয়েছে বিভিন্ন অজুহাতে অমানবিক নির্যাতন। ক্ষমতা ও আধিপত্যের নগ্ন থাবায় বিপর্যস্ত হয়েছে এ সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিপ্লব কুমার চাকমা তাঁর *পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে* গ্রন্থে পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ৮১টি রোমহর্ষক নির্যাতনের তালিকা দিয়েছেন। (বিপ্লব, ১৯৯৭ : ৭৫-৮৯) একইভাবে, সমতলের নৃজাতিগোষ্ঠীরাও নিরাপদে নেই এই রাষ্ট্রব্যবস্থায়। ভূমি দখল, বন উজাড়, ইকো পার্কের নামে এদের ঐতিহ্য-বিনষ্টির রমরমা আয়োজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে চলেছে।

প্রকৃত অর্থে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবাসীকে যেসব মর্মন্তুদ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা এদেশের অন্য জাতিগোষ্ঠীকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় একই আগ্রাসনের শিকার হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও মানবিক অধিকার থেকে শুরু করে তাদের ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য-ঐতিহ্য সর্বক্ষেত্রে বাঙালি বাড়িয়ে দিয়েছে আধিপত্যের থাবা। 'অপর' এবং 'আগন্তুক'-এর বেদনাবোধ ও বিপন্নতা এদের নিরাপত্তাবোধকে বিচূর্ণ করেছে। বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন বঞ্চনামূলক আচরণ ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে এই অসহায়ত্ববোধ তাদের মনে সঞ্চারিত করেছে :

> আমাদেরকে এদেশে মনে হয় আর থাকতে দেওয়া হবে না। সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারাসহ সবাই আমাদেরকে এদেশ থেকে যেভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার পায়তারা করছেন, প্রতিনিয়তই প্রশাসনের চোখে যেভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আমরা বিবেচিত হয়েছি-হচ্ছি এবং আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যেভাবে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হয়েছে-হচ্ছে তাতে এদেশে জন্মগ্রহণ করাটাই আমাদের জন্য অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে এখন। (সিলভানুস, ২০০২ : ২৬)

সঞ্জীব দ্রং-ও ক্ষোভে-অভিমানে লিখেছেন :

> ব্রিটিশ আমলেও আমরা আদিবাসীরা ভালো ছিলাম তুলনামূলকভাবে। কষ্টে এ কথাটা বললাম। পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্যু যেন শুরু হলো। বাংলাদেশ হওয়ার পর আদিবাসীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আমার এ কথাটা বাঙালি বন্ধুদের কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে? কিন্তু এটাই সত্যি, স্বাধীন বাংলাদেশ দুঃখ-অপমান-নির্যাতন-উচ্ছেদ-হয়রানি-সাম্প্রদায়িকতা-অন্ধকার ছাড়া আদিবাসীদের কিছুই দিতে পারেনি। (সঞ্জীব, ২০০৪ : ভূমিকা)

বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্ক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যে-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশে অন্য জাতিগোষ্ঠী বা আদিবাসীরা 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে'র শিকার। এমে সেজের ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কমাত্রা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

> ঝড়ের আওয়াজ কানে আসিতেছে। উহারা বলিতেছে অগ্রগতি হইয়াছে, অর্জন করিয়াছে, রোগব্যাধি নির্মূল হইয়াছে, জীবনযাত্রার মাত্র উন্নত হইয়াছে।
> আমি বলিতেছি কত সমাজের প্রাণ চিবড়াইয়া বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে, কত সংস্কৃতি জুতার তলায় পিষ্ট করা হইয়াছে, কত ধর্ম ধ্বংস করা হইয়াছে, বিস্ময়কর শিল্পকলার কত নিদর্শন গুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, অতুলনীয় কত সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
> উহারা আমার মুখে তথ্য ছুঁড়িয়ে মারিতেছে, দিতেছে সংখ্যার হিসাব, এত মাইল রাস্তা, এত মিটার খাল আর রেলপথ এত হাজার মাইল।
> আমি বলিতেছি কঙ্গো মহাসাগরে কোরবানি দেওয়া হাজার হাজার মানুষের কথা। যাহারা এই মুহূর্তে — আমি এই কথাগুলি যখন লিখিয়া বলিতেছি সেই মুহূর্তে — খালি হাতে আবিদজান বন্দরের মাটি খুঁড়িতেছে, আমি বলিতেছি তাহাদের কথা। আমি বলিতেছি লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা যাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদের দেবদেবী, তাহাদের জমিজমা, তাহাদের অভ্যাস আচরণ। ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদের জীবন — জীবন হইতে, নৃত্য হইতে, প্রজ্ঞা হইতে। (এমে, ২০১০ : ৩১৬)

বলা বাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতি ও জাতীয়তাবাদের আধিপত্যবাদী ভূমিকায় বাংলাদেশে অন্য জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এমে সেজেরের উপর্যুক্ত বিবরণের চেয়ে কোনো ক্ষেত্রেই ভিন্ন নয়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এসব বেদনার্ত অভিজ্ঞতার মর্ম ছুঁয়ে আদিবাসী কবিরাও তাঁদের কবিতায় বিস্তারিত করেছেন স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর উপর রাষ্ট্রশক্তি ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর

বহুমাত্রিক নিপীড়নের স্মারক। এসব কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁদের উপনিবেশবিরোধী চৈতন্য ও মনোভঙ্গি। একজন আফ্রিকান, লাতিন আমেরিকান কিংবা একজন বাঙালি কবিকে যে-স্বরভঙ্গিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখি, আদিবাসী বহু কবিতাও সেই ক্ষোভ-ঘৃণা দাহ থেকে উৎসারিত। লাতিন আমেরিকার কবি যেমন লিখেছেন :

আমি দেখি,
আমি দেখি কিছু ক্রীতদাস, দেখি
তাদের ধাতব হাত, দেখি
খনির গভীরে আর সূচীশিল্পে দক্ষ কিছু
কৃষ্ণকায় হাত —
সেই হাতগুলো সৃষ্টি করছে ঔজ্জ্বল্য
সেই হাতগুলো আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
জন্ম দিচ্ছে অসংখ্য ধারালো নখর। (জোয়াল, ২০০৭ : ১২৭)

উপর্যুক্ত কবিতার স্বগোত্রীয় হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায় নিম্নোক্ত আদিবাসী কবিতাকে :

আমাদের পুষ্পিত সুদিন পৌরাণিক
পাথুরে সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়
নষ্ট মানুষের পদভারে
ভুলে যাই স্বকীয়তা, স্বতন্ত্রতা আদিম নৃত্যকলা
এখন আর মাতি না বাদ্যের তালে তালে
জুমনৃত্য আর গানে
দিগ্বিদিক ওড়ে উদ্ভট বাদুর
উদ্ভট স্বপ্ন বুকে নিয়ে। (বচন, ২০০৫ক : ৪৯)

আবার নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচনে বাঙালি কবি যেমন লিখেছেন :

আমাদের স্বপ্নের চিত্রিত হরিণের গা থেকে যখন লাবণ্যময়
চামড়া খুলে নিয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুট-ব্যবসায়ীর দল,
যখন সাড়ে পাঁচ কোটি ভূমিহীন কৃষক চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের
মধ্যেও সাড়ে তিন হাত কবরের মাটি খুঁজে পাচ্ছে না,
নিবিড় পাটচাষের বদলে যখন অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে
নিবিড় কোটিপতির চাষ,
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো টিভির পর্দায় যখন পাশ্চাত্যের
হাঙর সংস্কৃতি এসে গিলে খাচ্ছে পদ্মার রূপালী ইলিশ,
যখন আমাদের শত্রুরা সংঘবদ্ধ, বন্ধুরা ঐক্যভ্রষ্ট—
তখন এই কবিতাটির ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।
(নির্মলেন্দু, ১৯৮৯ : ৯০)

একই প্রতিধ্বনি পাই নিচের চাকমা কবিতায়ও :

আদিবাসী উন্নয়ন!
নামে-বেনামে কত প্রকল্প, কত ষড়যন্ত্র,
কাগুজে উন্নয়ন ছুটে চলে ক্রমাগত
অথচ বাস্তবতায় শুধু হাহাকার আর দারিদ্র্য।
আদিবাসী ইস্যু
বাজারে উদ্ভাবিত নতুন পণ্য,
উর্ধ্বমুখী বিনিয়োগ; শেয়ার বাজার সবকিছুই
অন্ধকার কক্ষে চলে ষড়যন্ত্র
আর ভাগ হয়ে লভ্যাংশ।
আন্তর্জাতিক সংস্থা
এবং ডোনার এজেন্সী
আরো কতোজনের দেখেছি মুরুব্বিগিরি
তাদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট পাবার আশায়
প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে শেয়াল-নেকড়ের দল
আর মানবতাবাদী নামধারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী।
(ত্রিজিনাদ, ২০০৬ : ৭৬)

বস্তুত, আদিবাসী কবিতায় উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি ও আধিপত্যশীল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধ-কণ্ঠস্বর হিসেবে। বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদিবাসীদের অস্বীকৃতি, শোষণ, নির্যাতন এবং 'অপর' করে রাখার বাস্তবতা ও স্মৃতিপুঞ্জ তাই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হয়েছে আদিবাসী কবিতায়। এসব কবিতার ভেতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়েছে বাংলাদেশের অন্য জাতিগোষ্ঠীর উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার সারাৎসার।

৩

ঔপনিবেশিক কালেই অর্থের প্রতাপ উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন — 'মন! মন আবার কী? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙে গড়ে।' বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই উপলব্ধি আরো বেশি প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। ধনতন্ত্রের প্রসার, মুনাফার অপরিমিত লোভ আর অবাধ বাণিজ্যের এই বিশ্বায়নপর্বে টাকাই ধর্ম, টাকাই পরম আরাধ্য। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আদিবাসী সমাজকেও আবিলতায় আচ্ছন্ন করেছে। তাদের প্রকৃতিলগ্ন জীবনদর্শন আর সহজ জীবনযাপনের কাঠামো ভেঙে পড়ছে পুঁজিতন্ত্রের চাপে। শিক্ষা-চাকরি-বিত্ত-আরাম ইত্যাকার পুঁজিবাদী হাতছানিতে বহু আদিবাসী নিজের পেশা, ঐতিহ্য ছেড়ে ছুটছে শহরে-নগরে-রাজধানীতে। কেবল পুরুষরাই নয়, আদিবাসী রমণীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে বিউটি পারলারে, বিপণি-বিতানে। একদিকে পুঁজিনির্ভর অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় চাপ ও পেষণ, অন্যদিকে পুঁজিতান্ত্রিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে স্বজাতিদের ঐতিহ্যচ্যুতি — এই বিপন্ন পরিস্থিতিতে আদিবাসী জীবনব্যবস্থার আদিরূপ অতি দ্রুত

ক্ষয়প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীবনাদর্শের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছেন না অনেক আদিবাসী কবি। তাই উদ্ভূত বিপর্যয়ের অন্তর্গত কারণ হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা :

তিন-পিখিমীলাহরেয়র আক্কুরি এই ছব্বিঝ বঝরর গাভুর—
যার মন ঈদ ফিউডাল-ঔপনিবেশিক আদাম আর শহর
রাজ পূন্যাহর নিঝিরেদোর কজমা-স্বনত নাত-দি মরি যোয়্যে
তার সলং —
ক্যাপিটালর পোত্তি পয়জ্যর রুবোর বুগোত আগা রোইয়্যে।
বঙ্গানুবাদ :
তৃতীয় উপপ্লবের পূর্বে এ-চব্বিশ বছরের যুবক —
যার মন হৃদয় ফিউডাল-ঔপনিবেশিক গ্রাম আর শহর
রাজপূন্যাহর নিশুতিরাতের সবুজ-স্বপ্নে আত্মহনন করেছে
তার লাশ —
ধনতন্ত্রের প্রতিটি রূপালী পয়সার পাঁজরে আঁকা রয়েছে।
(সুহৃদ, ১৯৮৭ : ৩৫-৩৬)

পুঁজিতন্ত্রের প্রভাবে ব্যক্তিসত্তার এই মৃত্যু-উন্মুখ পরিস্থিতির পাশাপাশি পুঁজির দৌরাত্ম্যে মানবিকতার বিনাশও প্রত্যক্ষ করেছেন কবিরা। চাকরি ও জীবিকার জন্য 'ঘুষ' প্রদান ও গ্রহণের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও সম্মুখীন হচ্ছে আদিবাসী সমাজ। কবির হতাশামথিত উচ্চারণ :

চাকুরী নাম যখনি নিতে চাই
সবাই যেন ঘুষের হাত বাড়াই
মানুষ মানুষের জন্য আর নাই
শুধু তারা টাকাই চিনতে পাই
অসহায় নিরুপায় মানুষের কপালে
ঝিঙেফুল ফুটিবে না আর? (বারেন্দ্র, ২০০৬ : ১৩৯)

এভাবে পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত কবিদের ক্ষোভ-বেদনা উপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনাকেই প্রকাশ করে।

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভূমিহীন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখিয়ে অভিবাসিত করা হয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলগুলোয় আদিবাসীদের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস ও তাদের যূথবদ্ধতা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রীয় এই উদ্যোগের নগ্ন পরিচয় মেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার কর্তৃক প্রচারিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে —

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশাল এলাকা বেষ্টিত জিলা। এখানে লোকবসতি খুবই কম। এই জিলায় লাখ লাখ একর সরকারী খাস জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। যাহা উৎপাদনমূলক কোন কাজেই ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা এক জাতীয় অপচয়। বাংলাদেশ সরকার ইহাকে উৎপাদনশীল করার অভিপ্রায়ে দেশের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককুলের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণের

> সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। উৎসাহী কৃষক যাহারা চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চান তাহাদিগকে নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে :
> ক) ৫ (পাঁচ) একর পাহাড়ী জমি প্রতিটি উৎসাহী কৃষক পরিবারকে বিনা মূল্যে সাব কবলা করিয়া দেওয়া হইবে।
> খ) বসতি স্থাপনের জন্য ঘর বাড়ী তৈয়ার করা এবং অন্যান্য প্রাথমিক খরচ মিটানোর জন্য প্রতি পরিবারকে বিভিন্ন কিস্তিতে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র নগদ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।
> গ) প্রতি পরিবারকে প্রথম ৬ (ছয়) মাস বিনামূল্যে প্রতি সপ্তাহে ২১ (একুশ) সের গম বা ধান দেওয়া হইবে।
> ইহা ছাড়াও সরকারী খরচে পরিবারের সকলের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসা এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল ও মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
> উল্লেখিত ব্যবস্থাধীনে এই পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ পরিবারই ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। (মেসবাহ, ১৯৯৯ : ১০৮)

আদিবাসী অঞ্চলে বাঙালিদের এই অভিবাসন-প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য পূরণ হতেও বিলম্ব হয়নি। পার্বত্য অঞ্চলে ক্রমশ বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে আদিবাসী জনসংখ্যার সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটি পরিসংখ্যানে (মঙ্গল, ২০০৯ : ১৫৫) আদিবাসী ও বাঙালি জনমিতির হিসাবটি নিম্নরূপ :

সন	আদিবাসী জুম্ম		বাঙালি		মোট
	জনসংখ্যা	শতকরা হার	জনসংখ্যা	শতকরা হার	
১৯৪১	২,৩৯,৭৮৩	৯৭.০৬	৭,২৭০	২.৯৪	২,৪৭,০৫৩
১৯৫১	২,৬৯,১৭৭	৯৩,৭১	১৮,০৭০	৬.২৯	২,৮৭,২৪৭
১৯৬১	৩,৩৯,৭৫৭	৮৮.২৩	৪৫,৩২২	১১.৭৭	৩,৮৫,০৭৯
১৯৭১	৩,৯২,১৯৯	৭৭.১৭	১,৬০,০০০	২২.৮৪	৫,০৮,১৯৯
১৯৮১	৪,৪১,৭৭৪	৫৮.৭৭	৩,১৩,১৮৮	৪১.৪৮	৭,৫৪,৯৬২
১৯৯১	৫,০১,১৪৪	৫১.৪৩	৪,৭৩,৩০১	৪৮.৫৭	৯,৭৪,৪৪৫

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাঙালি অভিবাসনের এই অন্যায় প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আদিবাসী কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অভিজ্ঞতার করুণ বিবরণ :

> ক. আমিও তো ঈশ্বরের মানুষ হতে চাই
> কিন্তু এক উদ্যত দৃষ্টি আমাকে তাড়া করে
> লকলকে জিহ্বা সর্পের ন্যায়
> মিথ্যা অপবাদ দেয় আমাকে
> আর ষড়যন্ত্র করে উৎখাত করার।
> (নীলু , ২০০৫ক : ১৬)

খ. বন বাদাড় আর সাগর-পাড়ে, পাহাড় কিংবা সমতলে
শত সহস্র বছর ধরে, আছি যারা বসত করে
আতুড় ঘরের রুদ্ধ দ্বারে, যায়নি রাখা বন্দি করে
আমরা নাকি ভবঘুরে, ইতিহাসের ভুল বিচারে!

ঢোল মাদল আর নাগরা তারে, নেচে গেয়ে যারা দুঃখ ভোলে
তারা কেন আজ ঘর-ছাড়া হয়, বন-ছাড়া হয়, কিসের দায়ে?
(স্বপন, ২০১৩ : ৫৩)

গ. পাহাড়ে যখন ছিলাম
দুর্ভেদ্য জঙ্গলেও এতো অন্ধকার দেখিনি
সাগর দেখবো বলে
সময়ের স্রোতে সুউচ্চ পাহাড় ছেড়ে
ছুটে এলাম
আলোর জোয়ারে ভাসবো বলে
সভ্য সমাজে মিতালী করলাম
জোয়ার পাইনি।
আসলে কোথাও জ্যোৎস্না নেই, পূর্ণিমা নেই।
(জেমস, ২০০৫ক : ২৩)

নিরাপত্তার অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে অসংখ্য সামরিক ক্যাম্প। ৩টি জেলায় ৬টি ক্যান্টনমেন্টসহ আর্মি ক্যাম্পের সংখ্যা ছিল পূর্বে ৫ শতাধিক। শান্তিচুক্তির পর ৩৫টি এবং বর্তমানে আরো ৩০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও পার্বত্য অঞ্চলে এখনো ৪ শতাধিক আর্মি ক্যাম্প রয়েছে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কাউখালি-কলম্পাতি, বড়কল, পানছড়ি, মাটিরাঙা, লংগদু লোগাং হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাত দূর করার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। সেনাবাহিনী বরং পুনর্বাসিত বাঙালিদের সহায়তা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই পাহাড়িদের বাসস্থান, জুমখেত ও ভূমি দখল করছে বাঙালিরা। (গোলাম, ২০১০ : ২৮) এই রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও পক্ষপাতিত্বের যন্ত্রণা নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য আদিবাসী কবিতা :

ক. প্রতিদিন ভোর হয়,
ভোরের বাতাসে থাকে বারুদের স্বাদ।
আমার বুক প্রতিদিন ক্ষত হয়
হৃদয়হীন বুলেটের আঘাতে।
আমার শরীর সিক্ত হয় রক্তের হোলিখেলায়।
আমার অশ্রুতে নির্মল জল নেই
সেখানে এখন লাশের তরী ভাসে।

সমাপ্তি চাই লাশের
সমাপ্তি চাই বারুদের স্বাদ।
সমাপ্তি চাই রক্তের হোলিখেলার। (তপন, ১৩৯৯ : ১১)

খ. মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা তুমি একবার এসে দেখে যাও
তোমার 'রা-খা-বা'র বুক জ্বলে যায়
পর্বতের চূড়ায় নব বসতি, ধ্বংস সব বনভূমি
দাবানলে ছারখার মানুষ
বাড়ছে জলপাই রঙের গাড়ির মহড়া, পিছু নেয়
স্বার্থবাদী এক ঝাঁক প্রতিবিপ্লবী, ছুঁড়ে হিংসার বাণী
তুমি একবার এসে দেখে যাও
দেখবে বেসামাল প্রতিরোধ। (শরৎ, ২০০৮ : ১১১)

গ. নিষ্পাপ ত্বকের ভেতর সন্ত্রাস করে জলপাই কীট;
জবর দখল হয়ে যায় সত্তার সমূহ পালক।
অগ্নি বুকে নিয়ে যে স্বপ্ন দ্যাখতাম একদা
অকস্মাৎ সে আগুনে পড়ে জল নড়ে পাতা।
শুদ্ধ রক্তগ্রন্থিতে নেমে আসে নপুংসক বর্তমান;
সামন্ত দাবদাহে পোড়ে ঘরদোর :
প্রিয়তম জুম। (জগৎ, ২০০৬ : ১৮৯)

বাঙালিদের অত্যাচার ও নির্যাতনে আদিবাসীরা এভাবেই হারিয়েছে জীবনযাপনের নিজস্ব ছন্দ, আনন্দ, উৎসব। নিয়ত আতঙ্ক আর নির্যাতনের স্মৃতি তাদের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহকে দিয়েছে নিরানন্দ স্রোত। সরকার, প্রশাসন — সর্বত্রই তারা নির্যাতিত, উপেক্ষিত । কিন্তু যখনই, এতটুকু প্রতিকারের প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়, ন্যায় বিচার প্রশস্ত বাহু মেলে ডাকে — তারা তখন বহু বঞ্চনার দাগ মুছে ফেলে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে :

তখন ভীষণ ভীষণ ভাল লাগে
কাছের মানুষটিকে আরো নিবিড় করে
ভালবাসতে ইচ্ছে করে।
নিতাই নদীর ভাঙা-গড়াও ভাল লাগে,
রাং, খ্রাম, আদরু বাজিয়ে,
নাচতে ইচ্ছে করে উন্মাতাল হয়ে
আত্মজ-আত্মজাদের নিয়ে। (রংদী, ২০০৭ : ১১)

দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংঘের চাপে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন এবং নিহত চলেশ রিছিলের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের ঘোষণার পর গারো কবির এই উচ্ছ্বাস প্রমাণ করে, তারা কতটা নিগ্রহ আর বিচারহীনতার নৈরাজ্যে বাস করে।

আইয়ুব হোসেন ও চারু হক রচিত *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী* গ্রন্থে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা 'অসম্পূর্ণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ-তালিকার বাইরেও নাম-না-জানা আরো আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। তালিকায় মণিপুরী, গারো, সাঁওতাল, মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, ওরাঁও, মুণ্ডা, রাখাইন, বম জাতিগোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের বিপুলসংখ্যক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, ক্ষতি, অবদান — কিছুরই স্বীকৃতি মেলেনি। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত

হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণি ও সামন্তপ্রথার মধ্যকার সাংঘর্ষিক বাস্তবতা থেকে। অপরদিকে, ইউরোপের দেখানো পথে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মুক্তিচেতনার প্রতিনিধি রূপে। ফলে স্বভাবতই ইতিহাসবিদদের লেখায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন হিসেবে যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার সামান্যতমও পায়নি নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর আন্দোলন, আদিবাসীদের তো নয়ই। অথচ ব্রিটিশ শাসনকালে সংঘটিত ১৭৭০ ও ১৭৭৯ সালের তুয়ার বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালের খাসি বিদ্রোহ, ১৭৮৯ সালের গঞ্জাস বিদ্রোহ, ১৮০৮ সালের খান্দেশ বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালের মানভূজ ভূমিজ বিদ্রোহ, ১৮৩৯ সালের নাগা বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৯৫-১৯০১ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহ, ১৮৩৭ ও ১৮৮২ সালের ময়মনসিংহ গারো বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালের হাজংদের টংক বিদ্রোহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ঈশানী ও জোবাইদা, ২০০৯ : ৬৯)

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু আদিবাসী জনতাও বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, নিহত হয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক স্বীকৃতিহীনতার মতো মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অংশগ্রহণকেও এদেশের ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে গিয়েছেন। এই বঞ্চনার বোধ থেকে শহীদ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে কবিরা লিখেছেন :

ক. হে বীর মুক্তিযোদ্ধা,
কবি নাইবা লিখুক তোমার বীরগাঁথা কাহিনী
বা আত্মদানের করুণ ইতিহাস
তবু মাতৃভূমি সস্নেহে আশ্রয় দেবে
তৃপ্ত হবে তোমার রক্তের বলিদান।
(নীলু, ২০০৫খ : ১২)

খ. শহীদ পরিমলের রক্তে আমিতো বলেই দিয়েছি
একাত্তরে আমিও মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম
মায়ের কোলে শত্রুসেনা সে আমার সহ্যের অতীত।
তারপরও ভালোবাসার কথা বলতে বলো
মা-মৃত্তিকার কথা বলতে বলো...
সোনার বাংলা... গাইতে বলো
গারোদের কথা লিখতে বলো।
(জেমস, ২০০৫খ : ২২)

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে কতটা নিগৃহীত, তার প্রমাণ মেলে একটি তথ্যেই — 'উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে দরিদ্র সাঁওতালদের খাবার ও চা খেতে দেয়া হয় না।' (জোবাইদা, ২০০৯ : ৮৬) শ্রমমজুরির ক্ষেত্রেও আদিবাসীরা প্রচণ্ড বৈষম্যের শিকার। বাঙালি ক্ষেতমজুর যেখানে ২৫ টাকা পান, সেখানে আদিবাসী ক্ষেতমজুর পান মাত্র ১৫ থেকে ২০ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে খামারে রাবার চাষ করা হয়। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র পাহাড়িদের 'উন্নয়ন' ঘটানো, কিন্তু সেখানেও মজুরি বন্টনের পার্থক্য দেখা যায়। এ খামারের একজন আদিবাসী কর্মী সুরেশ্বরী দেওয়ান

জানান : 'আমা জুমু ওনোর দোন ছয় হাজার টাঙা আর বাঙাল ওখান দোন হলদে ২১ টাকা হাজার টাঙা' [আমাদের পাহাড়িদের চার বছরে দেয়া হয় ৬ হাজার টাকা এবং সেখানে বাঙালিদের দেয়া হয় ২১ হাজার টাকা] (জোবাইদা, ২০০৯ : ৮৭)। মজুরি-বৈষম্যের পাশাপাশি আদিবাসীদের প্রাপ্য টাকা বহুদিন ঘুরিয়ে দেয়া, কখনো-কখনো বাকি টাকা না-দেবার ঘটনাও ঘটে। টাকার জন্য তাগাদা দিলে, কাজ থেকে বহিষ্কারের হুমকিও পেতে হয় তাদের। এসব সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের বহু স্মৃতি ধারণ করে আছে আদিবাসী কবিতা :

ক. পিদ দির বুক দির আহ্‌ধ দির থেঙ দির
গোদা কেইয়্যা গোঝেই দির
দেজ দির জাত দির মু-চেই বেরে দিয়
নির নির নির কমলে কোই উধির।
বঙ্গানুবাদ :
পীঠ দিচ্ছি, বুক দিচ্ছি হাত দিচ্ছি পা দিচ্ছি
সারা শরীর বিলিয়ে দিচ্ছি
দেশ-জাত সবই দিচ্ছি মুখ চেয়ে কিছু বলছি না
নিচ্ছি নিচ্ছি বলে কখনো বলিনি
(মৃত্তিকা, ২০০৬ক : ৮৬-৮৭)

খ. আমাদের কথা খুব বেশি ভাল লাগবে না হয়তো কারো
কারণ আমরা অরণ্যচারী বঞ্চিত আদিবাসী গারো।
সরলতা যাদের আসল ধর্ম, মুখে মুখে যারা করে কাব্য,
মুখোশ পরা এ সভ্যতার যুগেও আমরা হলাম না সভ্য।
কতবার হয়েছি ভিটেমাটি ছাড়া, হয়েছি কতবার নিঃসম্বল
আরতো কিছু নেই, আছে শুধু খেটে খাওয়া আছে অশ্রুজল।
বহুদিন ধরে যারা আমাদের ঠকিয়ে নিল, করল লুটপাট,
আজ শ্রমিক হয়ে আমরা তাদের কাছেই পাচ্ছি পদাঘাত।
(মতেন্দ্র, ২০০৫ ক : ৩৬)

দেশে দেশে সরকার, কোম্পানি, কাগজ ও মণ্ডশিল্প এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্লান্টেশনে জোরালো সমর্থন ও প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এরাই বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় পর্যায়ে 'সরল প্লান্টেশন ফরেস্ট্রি' প্রাকৃতিক বনের চেয়ে অনেকগুণ বেশি কাঠ উৎপাদনে সক্ষম এমন প্রচারণা চালিয়ে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের 'ক্ষয়িত', 'বিনষ্ট', 'দখল হয়ে যাওয়া' এবং 'কম উৎপাদনশীল' বনভূমি প্লান্টেশনের লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু 'কম উৎপাদনশীল' বা 'বিনষ্ট' বলে যেসব বনভূমি চিহ্নিত করা হয় তা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক অরণ্য যার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত এবং পরিবেশ-মূল্য অপরিসীম। (ফিলিপ, ২০০৪ : ৷রর) আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বিদেশি প্রজাতি দিয়ে বনায়ন শুরু হয় ইংরেজ শাসকদের হাতে, ১৮৭৩ সালে। ইংরেজ আমলে এই বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা শুরু হলেও এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে। সরকারি বনভূমিতে বিদেশি ও আগ্রাসী প্রজাতি দিয়ে প্লান্টেশনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছে এবং বনে বসবাসকারী আদিবাসী জীবনে নেমে এসেছে দুর্দশা।

সরকারি বনভূমিতে সেগুন, রাবার, ইউক্যালিপ্টাস, আকাশিয়া, পাইন প্রভৃতি বিদেশি প্রজাতির যে-কৃত্রিম বন গড়ে উঠেছে, তা তৈরি করতে নিধন করা হয়েছে শত-শত প্রজাতির দেশীয় বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। বাণিজ্যিক স্বার্থোদ্ধারে দেশীয় বৃক্ষের বিনাশই কেবল নয়, বিদেশি প্রজাতির বৃক্ষের প্রভাবে জীবজন্তু-কীটপতঙ্গ তথা প্রকৃতির উপর পড়েছে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব।

কৃত্রিম ও বাণিজ্যিক বনায়নের কারণে শত-শত বছর ধরে বনে বসবাসকারী আদিবাসীদের প্রবেশাধিকার খুব সীমিত হয়ে গেছে। আদিবাসীরা বন থেকে তাদের দরকারি ফলমূল, শাকসবজি এবং নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু প্লান্টেশন যেসব জায়গায় হয়েছে এবং হচ্ছে সেসব জায়গায় শাকসবজি ও ফলমূল আপনা থেকে তৈরি হবার পথ আর থাকছে না। তাছাড়া প্লান্টেশনের কারণে হয় আদিবাসীরা উচ্ছেদের মুখে পড়ছেন, নতুবা তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর শালবন এলাকাসহ অনেক জায়গায় বাণিজ্যিক বনায়নের কারণে বহু আদিবাসী উচ্ছেদ হয়েছেন এবং অভ্যন্তরীণ ও পরিবেশ-উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছেন। (ফিলিপ, ২০০৪ : ২২) মধুপুরে ইকোপার্ক স্থাপনের ফলে আদিবাসী জীবনে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে সাইলো স্নাল জানান :

> মান্দি মহিলারা জংগল ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ওয়াল দিয়া বেড়া দিলে জংগলে যাওয়া সমস্যা। টিকিটের ব্যবস্থা চালু হবে। লাকড়ি আনতে, আলু আনতে জংগলে যেতে হয়। ফরেস্ট গার্ডরা আমাদের অত্যাচার করে, ইকোপার্ক চালু হলে এই অত্যাচার আরো বাড়বো। ইকোপার্কের জন্য এক ছেলে হারাইছি, জানি না ইকোপার্ক হইলে আরো কত ছেলেরে হারাতে হবে। আমরা এখনও আমাদের পুত্র হত্যার কোনো সুবিচার পাইনি। আমরাও তো এদেশেরই মানুষ, বিচার পাওয়ার অধিকার কি আমাদের নাই? (পাভেল, ২০০৭ : ২৮)

এই অসহায় আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে অসংখ্য মান্দি কবিতায়। বনবিনাশের মাধ্যমে আদিবাসীদের জীবনপ্রবাহ হুমকির মুখে ঠেলে দেবার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন অন্যান্য ভুক্তভোগী আদিবাসী গোষ্ঠীও। নিম্নোক্ত কাব্যাংশগুলো সেই বেদনা-পুরাণের সাক্ষ্যবহ :

ক. পাহাড়টা আজ বড্ড বিমর্ষ লাগছে
শাল গাছটাও দেখছি কে কেটে ফেলেছে
আমার প্রিয় ছিল সেই শাল গাছটি
সেখানে বসেই আমি রোজ বাঁশি বাজাতাম।
রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে বনরক্ষীরা (!)
শুনেছি ওরা নাকি আমাদের বন রক্ষা করে (!)
কিন্তু আমার প্রিয় শাল গাছটা কোথায় গেল?
শুধু আমার প্রিয় গাছটা কেন, কোন গাছও আর নেই;
পাহাড়টা ন্যাড়া মাথায় দাঁড়িয়ে আছে;
ওরা নাকি বন রক্ষা করে (!)
আমার বন্ধু হনুমান আর পাখিগুলি কেন হারিয়ে যায়?
(অরণ্য, ২০০৫ : ৪৮)

খ. পাহাড়গুলো আজ বিরাণভূমি গুই সাপের বিচরণ হয় না
পাহাড়ের ছড়াগুলোয় কাঁকড়াদের আকাল
বনরুই আর সজারুদের লুকিয়ে থাকার ঝোপঝাড় নেই
আমাদের সাথে আর থাকে না কেৎকেত্তে ছলক আর মল্লারা
ঘিলা, লাটিম আর বলিখেলা আর হয় না
পাহাড়গুলো তলিয়ে গেছে কাপ্তাই হ্রদে।
(পদ্মলোচন, ২০০৬ : ২২০)

আধুনিকতার প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ও মানব কর্তৃত্বের প্রকল্পে প্রকৃতি চিহ্নিত হয়েছে 'অপর' সত্তারূপে। প্রকৃতিকে দখল করে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার ও ধ্বংস করার আধিপত্যবাদী মানসিকতা ইউরোপ থেকে উপনিবেশসূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে উপনিবেশিত রাষ্ট্রসমূহে। বাংলাদেশেও বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কেটে দালান তোলা, নদীতে বাঁধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড প্রকৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে তারা আপন সত্তার অংশ হিসেবেই গণ্য করে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের এই অদ্বৈত সম্পর্ক 'আধুনিকতাবাদী' মানসিকতার ভিন্ন মেরুতে। ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৃক্ষনিধন, পাহাড় ধ্বংস কিংবা বাঁধ-নির্মাণ তাঁদের কাছে স্বীয় অস্তিত্বেরই বিনাশ হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে প্রকৃতি রক্ষার দাবি তাদের অস্তিত্ব রক্ষারই দাবি। চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ কিংবা মধুপুরে বৃক্ষ কেটে ইকোপার্ক নির্মাণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠী মেনে নিতে পারে নি। সম্মিলিতভাবে তারা প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়েছে। আদিবাসীদের কবিতায়ও প্রকৃতির প্রতি এই আত্মলগ্নতার প্রসঙ্গ বহুভাবে উচ্চারিত, আধুনিকতাবাদী পুঁজিতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধ-প্রকাশ হিসেবেই তা বিবেচনার দাবি রাখে :

মেঘালয়, বাঘমারার উঁচু উঁচু পাহাড়ের
বুক চিরে এসেছো উদ্যমে
বাংলার মান্দি জনপদে
সোমেশ্বরী, তুমি নাকি মান্দির মাতা?
কি রাণীখং, কি দুর্গাপুর, কি বিরিশিরি
নিজ স্তনের দুধে মান্দিদের
লালিত করো মাতৃস্নেহে; (লেবিসন, ২০০৭ : ৪২)

প্রকৃতিকে নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গে এভাবেই একীভূত করে নিয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বিপন্ন প্রকৃতিকে রক্ষার পাশাপাশি তাদের কাব্যে-গানে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ তাই একাত্ম হয়ে আছে। দেখা যায়, শস্য রোপণে ওরাওঁ সমাজে ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি দক্ষ। জমিতে প্রবেশের সময় মেয়েরা আঁটসাঁটভাবে শাড়ি পরে নেয়, যাতে ধানের গোছায় কাপড় লেগে কোনো ক্ষতি হতে না পারে। তবে, কখনো-কখনো মেয়েরা ব্যস্ততা বা অসতর্কতাবশত শাড়ি ঠিকভাবে বেঁধে নিতে পারে না। আর তাদের উদ্দেশ্য ওরাওঁ কবির উচ্চারণ :

রোপা যে রোপাই জোড়ি
লেসের পেসের

বাইল যে হোয়াই ছোড়ি
সেবের সেবের
লুগা যে পিন্ধায় ছোড়ি
কুচিয়াই কুচিয়াই।
বঙ্গানুবাদ :
মেয়ে তুমি কেমন করে
রোপা লাগাচ্ছো;
এ রোপায় চাল হবে না।
কোঁচা দিয়ে শাড়ি পড়লে
রোপা লাগানো ভাল হবে না। (দিনাই, ১৯৯১ : ১৩৫)

ওরাওঁদের মতো অন্য জাতিসত্তার কবিতাতেও লক্ষ করা যায় নিসর্গের সঙ্গে আদিবাসী-জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। প্রকৃতির নানা সুষমা ও ঐশ্বর্যে তাঁরা আপ্লুত হয়, রচনা করে অন্তর্গূঢ় অনুভবের কাব্যশস্য :

ক. চিরচিঠি ফুলি লো
জামভারী ফুলা কেইসে শোভায়
রাম রাম ঘোড়া
ফানলা ধার কারুরে
বাহিন কা হিয়া
লরা গিরাই।
বঙ্গানুবাদ :
আলের ধারে ফুল ফুটেছে
ঘন ফুল কি অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করেছে।
রাম, ঘোড়া থামাও
আমার বোনকে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে দাও,
ফুলের জন্য তার নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।
(আন্ধারী, ১৯৯১ : ১৩২)

খ. কবিতা সর কাদিমাস্যা মোনমাধাত বার্গীপাল উরি যানার ধ্রুপদী ভঙ্গিমা
বিজুপেইকর গলাভাঙি গানা গীদ;
রাঙারোদে জুমভরা রাঙা কম্পোই ধানছরায় সাজেয়্যে স্বরলিপি।
কবিতা মর গেংসুল্যের ভাঙাবেহলার লাভমেয়্যে কানানিত ফুদোয়্যে
বনাবনা শদরক ফুলর ফুলছরা।
বঙ্গানুবাদ :
কবিতা আমার কার্তিকে শৈলচূড়ায় উড়ে চলা বার্গীর ধ্রুপদী ভঙ্গিমা
বিজুপাখির গলা ছেড়ে গাওয়া গান;
রাঙারোদে জুমভরা সোনালী কম্পোই শীর্ষে সাজানো স্বরলিপি।
কবিতা আমার গেংখুলীর ভাঙা বেহালার প্রণয়-ক্রন্দনে-প্রসবিত
শরদক ফুলের ফুলমালা। (সুহৃদ, ১৯৮৭ : ২৩-২৪)

গ. তাই মন আমার যেতে চায় পাহাড়ের কাছে —
যেখানে আমার পূর্বপুরুষের লবণাক্ত ঘাম আর কঠিন শ্রমের শিকড় গ্রথিত;

মন আমার যেতে চায় ঝর্ণার কাছে —
যে শুধু হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে জানে;
মন আমার যেতে চায় ফুরফুরে দখিন হাওয়ার কাছে —
যে হাওয়া শরীরের ক্লান্তির ঘাম মুছে দেয় নির্দ্বিধায়।
(শ্যামল, ২০০৬ : ১২২)

আদিবাসীরা একাত্ম প্রকৃতির সঙ্গে। অরণ্য, পাহাড়, পশুপাখি, আর আদিগন্ত আকাশ তাদের সত্তায় অন্তর্লীন। ফলে, আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, সহিংস আক্রমণের বেদনা, ভীতি স্পর্শ করেছে প্রকৃতিকেও। এমন অভেদাত্মক বিশ্বাস থেকেই রচিত হয়েছে গারো কবিতা :

আমি কবিতা লিখব আদিবাসীদের আত্মত্যাগ নিয়ে।
এমন সময় এক ঝড়ো বাতাস বয়ে গেল,
গাছের ডালে নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত পাখিরা উড়ে গেল,
মনে হল এই মধুপুরের অরণ্যে ঘুমন্ত পাখিরাও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না
কখন কোন সময়েই বা শত্রুরা আঘাত হানবে
তাদের সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলো শকুনের মতো গিলে খাবে
তাই তারা এক বিকট আর্তনাদ করে
বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে উড়ে গেল। (মিলি, ২০০৬ : ৯)

ঔপনিবেশিক শাসকরা উপনিবেশিত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যেমন অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করে, তেমনি তাদের আগ্রাসনের শিকারও হয়ে ওঠে স্থানীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি। ১৭৮৮ সালে ব্রিটিশরা উপনিবেশ স্থাপনের আগে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত প্রায় ১০ লাখ আদিবাসীর মধ্যে ২৫০টি ভাষা প্রচলিত ছিল। দখলদারিত্বের পর গত প্রায় ২৫০ বছরে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ মিলিয়নে। অথচ আদিবাসীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৭০ হাজারে। আদিবাসীদের প্রচলিত ভাষার মধ্যে শতাধিক ভাষার হদিস নেই। ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার এক সরকারি জরিপে দেখা গেছে, আদিবাসীদের মধ্যে ১৪৫ টি ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে ১১০টি বিলুপ্তির পথে। (*সাপ্তাহিক ২০০০*, ২০১১ : ৭৬) বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষাসমূহও একই পরিণতির শিকার। উদাহরণ হিসেবে গারো জাতির ভাষিক অবস্থার পরিচয় নেয়া যেতে পারে।

গারো সমাজ অনক্ষর সমাজ। অর্থাৎ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাবনাপুঞ্জ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার জন্য নিজস্ব লিখিত হরফ গারো সমাজে আজো আবিষ্কৃত হয়নি। নিজেদের ভেতরে হরফ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হলেও সর্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রচলনের অভাবে, তা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি, ক্ষমতাধর জাতিগোষ্ঠীর প্রভাবেও এই চেষ্টা সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে আসামের ডেপুটি কমিশনার ডেভিড স্কটের প্রচেষ্টায় ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় তৎকালীন ভারতীয় গারো সমাজে লেখাপড়ার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি বা রোমান হরফের প্রচলন ঘটেছিল। 'তখন থেকেই ভারতীয় গারো সমাজে নিজেদের ভাষা চর্চা, প্রকাশ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত রোমান

হরফ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাথে সাথে তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশী গারো সমাজে লেখাপড়ার মাধ্যমে বাংলা ভাষা হওয়াতে লেখাপড়া, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ও পারিবারিক পরিবেশে কথাবার্তা ও বিভিন্ন সময়ের অবিরাম বাংলা ভাষার ব্যবহার গারোদের নিজ ভাষাকে ডাস্টবিনে ফেলে রাখার মত অবস্থার সৃষ্টি করেছে।' (সৃজন, ২০০১ : ১৩) অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজদের প্রভাবে গারোরা যেভাবে ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, একইভাবে বাংলাদেশেও তারা বাঙালিদের আধিপত্যে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ছে।

গারোদের আচিক ভাষায় লিখিত বর্ণমালা হারিয়ে গেলেও, তাদের মুখে-মুখে সুদীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল আচিক ভাষা। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজ মিশনারিদের ধর্মপ্রচারে আগমন, বাঙালিদের গারো-অঞ্চলে বসতি স্থাপন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নতুন প্রজন্মের গারোরা ভুলতে বসেছে তাদের নিজস্ব ভাষা। 'গারো ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে বাংলা মাধ্যমেই করতে হয়। অফিস-আদালতসহ সকল কাজকর্মেই তাদের বাংলা ব্যবহার করতে হয়। ফলে তাদের মাতৃভাষা চর্চা কমে যায়। এখন বাংলাদেশে প্রায় সোয়া লাখ গারো আদিবাসী বসবাস করে। যাদের প্রায় ৪০ হাজার বসবাস মধুপুর গড় অঞ্চলে। এ এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, স্কুল-পড়ুয়া শিশু যাদের বয়স ৫ থেকে ১২ বছরের মধ্যে তাদের অধিকাংশই মাতৃভাষা ভালভাবে জানে না।' (কামনাশীষ, ২০০৭ : ৯৫) এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজের ভাষা-বিলুপ্তির বেদনা তাই লক্ষ করা যায় অসংখ্য আদিবাসী কবিতায় :

ক. ফুলে ফুলে শহীদ মিনার ভরে গেছে
সালাম রফিক জব্বার বরকতদের পাহাড়সম উঁচু আত্মাগুলো
নিপুণ পূর্ণিমার আলোর মতো আছে ফুলের বিছানায়
আমাদের পুষ্পার্ঘ অর্পণের সাথে সাথে
আমাদের বর্ণমালাগুলো সলাজে বেড়িয়ে এল
তারা কি যেন বলতে চায়। (শিশির, ২০০৬ক : ১০০)

খ. জ্যোৎস্না ডুবে যায়, রাত গভীর হয়, সূর্য ওঠে না
হাজারো আলো ফেলে, ফোটেনা বিজু দিনে
সাতরঙা ফুল! নেই কোন বসতি, মুছে যায়
জ্বলে যায় সবুজ পাহাড়ের গেরস্থালী,
হায় বর্ণমালা! হায় চম্পকনগর! কোথায় তুমি?
আমরা যে বাঁচবোনা তোমাকে ছাড়া...
(বীর কুমার, ২০০৬ : ১৮০)

গ. আদুদি, ঐবু অসুম হাইনা খরা খরা তৌদুনা
মাঙখিগদৌরব'সুম লোন থোক্তবগী মপাল নাইদ্রবা 'ব্ল্যাকহেল' মদা।
বঙ্গানুবাদ :
তবে কি আমি এভাবেই
শেষাবধি হারিয়ে যাবো ভাষাহীনতার কৃষ্ণবিবরে?
(শেরাম, ২০০১ : ২৫)

বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীও মুক্ত নয়। উন্নয়নের নামে আদিবাসী অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে দাতাগোষ্ঠী, এনজিও, বহুজাতিক সংস্থাসমূহের হাত। এদের পশ্চিমা উন্নয়নতত্ত্বের মডেল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, প্রকৃতি তথা সামগ্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বদলে দিচ্ছে। খ্রিষ্টান মিশনারি ও বিভিন্ন এনজিওর তৎপরতায় ধর্মান্তরিত আদিবাসীরা রক্ষা করতে পারছেন না নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। ধর্ম বিশ্বাস এবং খ্রিষ্টীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি দ্বারা তারা বহুলাংশে প্লাবিত হয়েছেন। নিরন্তর চর্চা ও যাপনের কারণে তাদের ভেতর খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও সংস্কৃতিই দৃঢ়মূল হয়েছে। এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত কবিতাংশে :

রোদ ফোটার আলো এসে পড়েছিল
লাল কাঁকড়ের মাটিতে
তারই আলোক প্রভায় পৌরাণিক পিঁপড়েরা
আলো জ্বালালো শিক্ষা নামক লণ্ঠনে।
আচমকা থেকে যাওয়া উঁই পোকার
খাদ্য হতে থাকা
দামা, আদুরী, রাং, খ্রামগুলো
আপন সুর নিয়ে বেজে উঠল
আধুনিক উপাসনায়
প্রার্থনা, আরাধনার ভাষা হয়ে
খ্রিস্টের স্তুতি গেয়ে গেয়ে (বচন, ২০০৫খ : ৩৪)

এখানে স্পষ্টতই আদি গারো সম্প্রদায়ের চেয়ে ধর্মান্তরিত গারো সম্প্রদায়ের উন্নততর অভিযানের স্বীকৃতি ছড়িয়ে আছে। 'শিক্ষা নামক লণ্ঠনে' আলো জ্বালানোর ভেতর দিয়ে ধর্মান্তরিত গারো সম্প্রদায় যেন উদ্বর্তনের সাক্ষাৎ পেয়েছে। দামা, আদুরী, রাং, খ্রাম নামক তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রগুলো (যা নাকি উঁইপোকার খাদ্য হতে চলেছিল!) আজ বেজে উঠছে 'আধুনিক উপাসনায়'।

মিশনারিদের পাশাপাশি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় গভীরভাবে প্রভাবিত করছে আদিবাসীদের জীবন। জংলি এক ধরনের ফলের নামানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি স্থানের নাম ছিল 'জগনাতলী'। বর্তমানে সে জায়গাটির নাম হয়েছে 'জাহানারাতলী'। 'মহালছড়ি'র নাম পাল্টে 'মহলছড়ি' করার চেষ্টা চলছে। এই নামটি অধিকতর পরিচিতি করে তোলার জন্য 'মহলছড়ি' লেখা সাইনবোর্ডও ঝোলানো হয়েছে। বহুল পরিচিত মূল নাম 'নান্যাচর' এলাকাটিও এখন পরিবর্তিত হয়েছে 'নানিয়ারচর' নামে। বান্দরবনের মূল শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম 'রিগরিখেয়ং। মারমা ভাষায় 'রিগরিখেয়ং' মানে স্বচ্ছ জলের নদী। এই নদীটির নামও 'শঙ্খ নদী' নাম দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। বই পুস্তকে নদীটির নাম 'সাঙ্গু নদী' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (নোমান, মনিরুল ও প্রদীপ, ২০০৯ : ৭৫) আদিবাসীদের অভিযোগ — এভাবেই জায়গার নাম, নদীর নাম পাল্টে দিয়ে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর বাঙালিরা আগ্রাসন চালাচ্ছে।

পাহাড়ি অঞ্চলে বাঙালি অভিবাসন, ক্ষমতা ও আধিপত্যের সূত্রে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে বাঙালির শিক্ষা-রুচি-সংস্কৃতি-দর্শন যেভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের অনুগামী হয়েছে, একইভাবে আধিপত্যশীল বাঙালি সংস্কৃতিও গ্রাস করে নিচ্ছে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিধারা। আবার, মিশনারিদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও ঢুকে পড়ছে পার্বত্য অঞ্চলের বেশ কিছু আদিবাসীর জীবনে, সংস্কৃতিতে। বান্দরবানের বম, লুসাই ও পাঙ্খোয়া জাতিগোষ্ঠীর বেশির ভাগ মানুষ মিশনারিদের প্রচারণায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে বেশ আগে থেকে। এই তিন জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী এখন আর তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী জুম চাষে মনোযোগী নয়, তারা ছুটছে অর্থকর ফসল চাষে। ক্রিসমাস, থার্টি ফার্স্টের উৎসব প্রধান গুরুত্ব পাচ্ছে এদের সংস্কৃতিতে। বাসস্থান ও গৃহ নির্মাণের সংস্কৃতিও বদলে গেছে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর। পার্বত্য আদিবাসীদের অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠী (চাকমা, মারমা, খুমী, ম্রো, খিয়াং, চাক) দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় থাকতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশপর্বে নগরজীবনের ক্রম-প্রসারণ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, নগরের বিলাসী জীবনের মোহে অনেকেই শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এনজিও, পারলারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ নিয়ে ছুটছে বিভিন্ন নগরে।

গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও আদিবাসী অঞ্চলে সূচিত হয়েছে নানা পরিবর্তন। বসতবাড়ির চালায় ছনের ব্যবহারও এক রকম উঠে গেছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ছনের ঘর এখন দুর্লভ। তাদের ঘরের চালায় শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ব্রান্ডের ঢেউটিন। অনেকে আবার পাহাড়ের ওপর ইটের তৈরি বিলাসবহুল বাড়িও নির্মাণ করছে। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকেও এসেছে নানা পরিবর্তন। চাকমা জাতিগোষ্ঠীর সমাজ থেকে ধুতির ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে। অথচ এটিই ছিল তাদের ঐতিহ্যবাহী পরিধেয় বস্ত্র। আদিবাসী মেয়েরাও তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিত্যাগ করে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বাঙালি 'থ্রি-পিস' কালচারে। আদিবাসীদের প্রতিটি পরিবারেই পারিবারিক তাঁত ছিল, যাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈরি হতো। এখন সেই স্থান দখল করে নিয়েছে বার্মিজ ও টেক্সটাইল সামগ্রী। ঐতিহ্যবাহী পোশাক এখন শখের সামগ্রীতে রূপ নিয়েছে। শহরের অভিজাত বিপণিতে ঐতিহ্যবাহী কিছু পোশাক শোভা পেলেও, সেসবের দাম সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এছাড়া বর্তমানে আদিবাসীরা আধুনিক জীবনের পিছু ছোটায় ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরির মতো শ্রমসাধ্য কাজ করতেও অনেকে অনিচ্ছুক। পার্বত্য অঞ্চলে অধিক সংখ্যক বাঙালির অনুপ্রবেশের ফলে অন্য জাতিগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও জীবনাদর্শের পরিবর্তন পরিস্থিতিগত কারণেই সম্পন্ন হয়ে চলেছে। 'মাত্র এক যুগ আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনও আদিবাসী পরিবার রাতের বেলায়ও ঘরের দরজা বন্ধ করত না। কিন্তু এখন কোনও আদিবাসী পরিবারই দরজা খোলা রাখে না।... মূলত বাঙালি সমাজের চুরি, ধর্ষণ এবং ডাকাতির সংস্কৃতি পাহাড়েও ছড়িয়ে পড়ায় এটা হয়েছে। (নোমান, মনিরুল ও প্রদীপ, ২০০৯ : ৭৬) কেবল আত্মরক্ষা নয়, বাঙালির অপরাধ প্রবণতা পাহাড়িদেরও উদ্বুদ্ধ করছে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। কিছু আদিবাসী জড়িয়ে পড়েছে ছিনতাই, চুরি, ধর্ষণের মতো অপরাধে — যা পূর্বে আদিবাসী সংস্কৃতিতে কখনো দেখা যায়নি।

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে বসবাসের সূত্রে আদিবাসী বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায়ও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পূর্বে শূকরের মাংস এবং মদ ছিল আদিবাসী বিয়ের অপরিহার্য ভোজ্য। এখন শূকরের বদলে পরিবেশিত হচ্ছে ছাগল ও ফার্মের মুরগি। মদের পরিবর্তে কোক বা অন্য কোনো ঠাণ্ডা পানীয়। 'একজন চাকমা বৃদ্ধের ভাষ্য, বিয়েতে শূকরের মাংস দিতে অস্বস্তি লাগে। কারণ ওখানে প্রতিবেশী মুসলমান, হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকে।' (নোমান, মনিরুল ও প্রদীপ, ২০০৯ : ৭৬)

চাকমাদের বিজু উৎসব পালনে পূর্বে আচরিত হত বিভিন্ন প্রথা। যেমন : সকালে ঘুম থেকে জেগে স্নানপর্ব সেরে ধানের ডালা হাতে নিয়ে পাড়াময় ঘুরে মুরগিকে ধান খাওয়ানো, পরিবারের বৃদ্ধকে কোলে নিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া, গোয়াল ঘর থেকে গরু নিয়ে গোসল করিয়ে গলায় মালা পরানো ইত্যাদি। কিন্তু এখন বিজু উৎসব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কেবল শোভাযাত্রার মধ্যে। পূর্বে ৪২ পদের সবজি দিয়ে রান্না হতো বিজুর মূল খাবার 'পাজন'। সঙ্গে থাকত পিঠা, কলা, মিষ্টি আলুসহ ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি খাবার। এখন চলছে ভাত-মাংস পরিবেশনের সংস্কৃতি। সঙ্গে থাকছে মিষ্টি এবং জিলাপি। মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব সাংগ্রাই। এই উৎসবের দিন মারমা তরুণ-তরুণীরা পাড়াময় ঘুরে-ঘুরে মঙ্গল কামনায় একে অপরের দিকে 'মঙ্গলজল' ছিটিয়ে দিত। এই রেওয়াজকে বাঙালিরা বিকৃত করে নাম দিয়েছে 'জলকেলি'। এই উৎসবও পাহাড়ের উন্মুক্ত প্রান্তর ছেড়ে ঠাঁই পেয়েছে প্যান্ডেলের আবদ্ধতায়। বাঙালিদের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে জল-ছিটানোর ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানটি স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে প্যান্ডেলের আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। পাহাড়িদের সংগীত চর্চায় ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে। ঢোল, তবলা, খোল, বাঁশি, কাঠের তৈরি জলতরঙ্গ প্রভৃতির বদলে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে অক্টোপ্যাড, গিটার, কি-বোর্ডসহ পশ্চিমা আধুনিক বাদ্যযন্ত্র।

সংস্কৃতিগত এই আগ্রাসন মোকাবেলায় আদিবাসীদের কবিতায় তাই নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার আকুতি বারংবার উচ্চারিত। পর-সংস্কৃতির আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টার পরিচয় মেলে কবিতায় তাঁদের নিজস্ব উৎসব, বিশ্বাস, ঐতিহ্যের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে। তাঁদের স্বতন্ত্র লোকাচার, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক — অর্থাৎ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় কবিতায় মুদ্রিতকরণের মাধ্যমে আদিবাসী কবিরা পর-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধী ভাষ্য। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনারই সাক্ষ্যবহ। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে আদিবাসী কবিদের স্ব-স্ব ঐতিহ্যানুবর্তিতার পরিচয় মিলবে :

ক. সেই বেহালার তার কবে কখন ছিঁড়ে গেছে
এখন নীলাম্বর গেংখুলী ঘুরে বেড়ায়
রাঙ্গামাটির রাঙাপান্যার কালো পিচের মসৃণ রাস্তায়
চেঙেই কাচালং ফেনীর বিস্তীর্ণ জনপদ ঘুরে ঘুরে
গেয়ে গেল কত রাধামন ধনপুদি পালা,
চাদিগাং ছাড়া পালা
কত যুবককে করেছে মাতাল
কত যুবতীর মন রাঙানো তার মিষ্টি সুর

কত রেং উত্তাল করল ভোরের ক্লান্ত ক্ষণ
কোথায় গেল সেই রেং।
কোথায় হারিয়ে গেল নীলাম্বর গেংখুলীর গান।
(শিশির, ২০০৬খ : ১০৭)

খ. কোথায় গেলে চম্পক নগর কোথায় গেলে চাদিগাঙ
কোথায় পুবংতুলি দিও মুড়া
কোথায় গেলে স্বর্ণালী দিনগুলো
খুঁজে দেখ ইতিহাসের পাতায় কি রয়েছে লেখা
হারিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে ফেললাম
খালি হাতে কোথায় এলাম
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম চিরদিনের জন্য।
কত রাজা আসে কত রাজা যায়
সবতো নিয়ে গেল
আমাদের রাজা কি পেল কেহইতো দেখা পেল না
ভেঙ্গে গেল জাতির মেরুদণ্ড হারিয়ে গেল অস্তিত্ব।
হাজার সাধলেও পাওয়া যাবে না
সেই পুরানো সুদিনের ইতিহাসের পাতা।
(তরুণ, ২০০৬ : ১৭৩)

টমাস বেবিংটন মেকলের 'রক্তে-মাংসে ভারতীয় কিন্তু মগজে-মননে ইংরেজ' তৈরির প্রকল্প ব্রিটিশ রাজশক্তি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করেছিল ভারতবাসীর উপর। এভাবে তাদের অনুগত একটি গোষ্ঠীও তারা তৈরি করে নিয়েছিল। ইংরেজ-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশা ও ব্যবসাসূত্রে ইংরেজদের স্বার্থরজ্জুতে বাঁধা এই মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে। শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে উপনিবেশমুক্তির পরও এরা জনগণের বান্ধব হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজেও এমন একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে — যারা 'আধুনিক' 'নাগরিক' কিংবা উচ্চবিত্ত হবার স্বপ্নে নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে শহরে-নগরে গড়ে তুলছে নিজস্ব আবাস। পুঁজিতান্ত্রিক মানসিকতায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলা এবং সেই সঙ্গে বাঙালি বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে লালনের চেষ্টারত এই শ্রেণিকে আদিবাসী সমাজ 'প্রতারক' হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও নিপীড়িত স্বজনদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকে উপেক্ষা করে যারা হাত মিলিয়েছে শোষকরূপী বাঙালি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের প্রতি কবিদের ক্ষোভও অগ্নিক্ষরা :

ক. দুলুগর ধার নূঅ-আমলির আদুরি হাজাদি যার
সে সমারে চিদি-বা পুগর পুনমাদা লেয়ে দি-যার
... ...
নিজ তুরুং ভরিবাত-তি আন্দারত ধান হুজে
মিজা পুগি হামর ন-হে যিয়ত-সিয়ত পেদা ছারে
জুম আজো বিজি হেই নাগর দালে আজার হেই

বঙ্গানুবাদ :
বেয়নটের আঘাতে নতুন সর্দারের নাড়ি-ভুঁড়ি ক্ষত-বিক্ষত
তারপরও ডোরাকাটা বাহিনীর গোলামি ছাড়ে না
... ...
আপন স্বার্থ উদ্ধারে সর্দার অন্ধকার জগতের নিপুণ কারিগর
শ্বাপদসংকুল অরণ্য জনপদে সর্দার ডুমুরের ফুল।
জাত উদ্ধারের মন্ত্র যবে আখের গুছায় নিরাপদে
কিচির মিচির শব্দ করে পালিয়ে বেড়ায় ঢাকার রাজপথে।
(পরমেশ্বর, ২০০৫ : ২৬)

খ. কিন্তু কিছু মানুষ আছে, নিজের শশ্মান ঘর নিজেই
তৈরী করে হাত বাড়াতে চায় একাল ওকাল
দুই কালের সুখ সমৃদ্ধিতে। কত যুগ কত সভ্যতায়
সাজানো আবাস বিকিয়ে সর্বস্ব লুটতে চায় একাকী
জাতির নাম ডুবিয়ে। সেই কলংক কাটাবো কি করে?
এদেশের মাটিতে পড়ে আছে দুঃখী মানুষের
কত ঘাম, কত রক্তাক্ত হাড়গোড়। লোলুপ গন্ধ শুঁকে
ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কত রক্তচোষা জোঁক,
বারুদ চোখে চুষে নেয় সবুজ পাহাড়ের নিশ্বাস।
(বীর কুমার, ২০০৬ : ১৭৯)

উদ্ধৃত কাব্যাংশদুটিতে নিজস্ব স্বার্থে জাতির কল্যাণবোধ পায়ে-পিষে 'গোলামি' জীবন বেছে নেওয়া আদিবাসী শ্রেণিকে কবিরা ধিক্কার জানিয়েছেন। একইভাবে, বহু আদিবাসী রমণী স্বজাতি ছেড়ে প্রেম বা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে বাঙালি পুরুষের। এই প্রবণতাকেও সংস্কৃতিচ্যুতির স্বাক্ষর হিসেবে কবিরা নির্দেশ করেছেন। যেসব নারী নিজস্ব পোশাক, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে ছুটে যাচ্ছে বিজাতীয়দের নিকট, তাদের 'অধঃপতনে' ক্ষুব্ধ-ব্যথিত কবি চাপা রাখতে পারেননি অন্তর্দাহ :

আজ তাকে আদিবাসী মেয়ে বলে চেনা দুষ্কর
সে এখন যেন বিজাতীয়দের রত্নের আকর
বিজাতীরা তাকে নিয়ে যায় অজানা পার্কে
... ...
তার যে ছিল এত আদিবাসী সজ্জা
তাও হারিয়ে গেছে আজ,
... ...
দকমান্দা-দকশাড়ি আদিবাসীদের ঐতিহ্য
এগুলো সে আজ করে না গ্রাহ্য,
তার অধঃপতন হয়েছে
... ...
যে ভালবাসে না নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি
সে কিভাবে দেবে মানুষের প্রতি দৃষ্টি?
(সৌ সুবীর, ২০০৭ : ১২)

উদ্ধৃতাংশে নিজের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে ভালোবাসতে না-পারলে মানুষকেও যে ভালোবাসা যায় না — এই সত্যোচ্চারণ কবির দার্শনিক প্রজ্ঞারও পরিচয়বাহী।

বাংলাদেশে এখনো অনেক আদিবাসী সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার-ব্যবস্থা টিকে আছে। স্বভাবতই, এসব সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও অবস্থান অন্য যে-কোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে উন্নত। পণপ্রথা, যৌতুক, সম্পত্তির অসম বণ্টনসহ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রান্তিক অবস্থা ও নির্যাতনের যে-দীর্ঘ ঐতিহ্য, মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী সমাজসমূহে নারীরা সেই অবদমনের অভিশাপ থেকে অনেকাংশে মুক্ত। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুঁজিতন্ত্র যেভাবে ঢুকে পড়েছে, একইভাবে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারও প্রবেশ ঘটছে আদিবাসী সমাজে। পাহাড়ি বা সমতলের আদিবাসী অভিবাসী বাঙালি প্রতিবেশীদের সামাজিক প্রভাব এই পরিবর্তিত মানসিকতার অন্যতম কারণ। ফলে আদিবাসী সমাজেও আজ বিষফোঁড়ার মতো জেগে উঠেছে নারী-নির্যাতন, পীড়ন, এমনকি ধর্ষণের মতো অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাও। ফলে পুঁজিবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রান্তিক ও 'অপর' হয়ে-ওঠা নারীগোষ্ঠীর মুক্তিচেতনা যেমন উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার অঙ্গীভূত, তেমনি আদিবাসী কবিতায়ও আজ ধ্বনিত হচ্ছে নারীমুক্তির স্বপ্ন।

দরিদ্র আদিবাসী নারীরা দরিদ্র বাঙালি নারীর চেয়েও বেশি বৈষম্যের শিকার। কেননা তাঁরা শ্রেণিগতভাবে, জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে এবং লৈঙ্গিক বিচারে 'অধস্তন'। বাঙালি ক্ষেতমজুর যেখানে ২৫ টাকা পান, সেখানে আদিবাসী ক্ষেতমজুর পান মাত্র ১৫ থেকে ২০ টাকা। অন্যদিকে, আদিবাসী নারী ক্ষেতমজুরের অবস্থা আরো করুণ। একজন পুরুষ ক্ষেতমজুরের সমান কাজ করেও এরা মজুরি পান ৫ থেকে ৭ টাকা কম। টাকার বদলে ধান নেয়া হলে বঞ্চনা আরো বেড়ে যায়। চুক্তিভিত্তিক কাজে আদিবাসী পুরুষ এক মণ ধান পেলে মেয়েরা পান আধ মণ ধান। নাটোর জেলোর মোমিনপুর গ্রামের শিলা এক্কা জানান, 'এলাকার বাঙালিরা কাজের বাকি টাকা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে বছরের পর বছর ঘুরাতে থাকে। কাজ শেষে অশোভন প্রস্তাব দেয়।' (জোবাইদা, ২০০৯ : ৮৬) এভাবে মজুরি কম দেয়া, হয়রানি, যৌন-নিপীড়ন প্রভৃতি নির্যাতনের ভেতর দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় আদিবাসী নারীদের। বাঙালি ও পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যে নারী আরো প্রান্তিক হয়ে ওঠে :

ক. জ্বলি ন' উধিম কিত্তেই!
যিয়ান পরানে কয় সিয়ান গরিবে—
জন্মভূমত মানুচ বন্দী
মিলেরে কিন্যে দাসী বান্দী,
পহ্ররে কানা
সৃষ্টির বানা।
বঙ্গানুবাদ :
রুখে দাঁড়াব না কেন!
যা ইচ্ছে তাই করবে —
জন্মভূমে পরবাসী
নারীকে ক্রীতদাসী

দৃষ্টিকে অন্ধ
সৃষ্টিকে বন্ধ।
(কবিতা, ২০১৩ : ১৪৩)

খ. জ্বলে ওঠো পাহাড়ী নারী—মানুষ হয়ে,
দুহাতে রাতের অন্ধকার ঠেলে দিয়ে।
জ্বলে ওঠো বিশ্বের নারী পাহাড়ের নারীর কণ্ঠস্বরে,
জ্বলে ওঠো দুর্বার বেগে বীর সাহসী নারী—মানুষ হয়ে।
(জড়িতা, ২০০৫ : ৩১)

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত জাতিগত নিপীড়নের একটি অন্যতম রূপ হচ্ছে ধর্ষণ। সাধারণভাবে সমাজে নারী-নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন একটি জাতি তার রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যবহার করে অন্য জাতিসত্তাকে 'মূলস্রোতে' নিয়ে আসার নামে গ্রাস করার চেষ্টা চালায়, তখন শাসকগোষ্ঠীর কাছে নারী-ধর্ষণ হয়ে ওঠে এমন একটি অস্ত্র, যার মাধ্যমে সে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে রাখতে চায়। বাংলাদেশে জাতিগত নিপীড়নের ক্ষেত্রে ধর্ষণ জনগণের মধ্যে ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির একটি উপায় হিসেবে সেনাবাহিনীতে বেশ প্রিয়। (কবিতা, সামারী ও ইলিরা, ২০০১ : ১৩) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্বিচার বাঙালি নারী-ধর্ষণে এই মনস্তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত সেনা ক্যাম্পের বাসিন্দারাও আদিবাসী নারীর উপর চালাচ্ছে এই অমানবিক নৃশংসতা। সেনাবাহিনী ও বাঙালিদের নির্মম নির্যাতনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন থেকে প্রকাশিত *জীবন আমাদের নয়* নামক চাঞ্চল্যকর প্রামাণ্য গ্রন্থে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সূত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৯৩ সালে ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ৪ জন এবং ১৯৯৫ সালে ১২ জন আদিবাসী নারী ধর্ষিতা হয়। ১৯৬১ থেকে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা ৯৪% ধর্ষণ সংঘটিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কবিতা চাকমা জানান, ধর্ষণ বাদেও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহাড়ি নারীদের অপহরণসহ অনেক ধরনের যৌন হয়রানি করে। এছাড়া প্রকৃত ধর্ষণের সংখ্যাও প্রাপ্ত হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি, কেননা অনেক ধর্ষিত নারীই লোকলজ্জার ভয়ে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন না। (জোবাইদা, ২০০৯ : ৯০)

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাকমাকে অপহরণের ঘটনায় সেনাবাহিনীর সদস্যের প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রমাণিত। ১৯৯৬ সালের ১১ জুনের মধ্যরাতে কল্পনা চাকমা তাঁর লাল্ল্যাঘোনা গ্রামের বাড়ি থেকে অপহৃত হন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সেই অপহরণকারী দলে সামরিক পোশাক পরিহিত লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসসহ ক্যাম্প কমান্ডার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিল। (জোবাইদা, ২০০৯ : ৮৯) কল্পনা চাকমার সংগ্রাম একদিকে যেমন ছিল রাষ্ট্রীয় অধিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ছিল পুরুষ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ফলে তাঁকে দমন করতে অপহরণের আশ্রয় নেয় আধিপত্যবাদী শ্রেণি। কল্পনার মুক্তির দাবিতে প্রাণ হারিয়েছে রূপম মনতোষ, সমর, বিজয় ও সুকেশ নামের চার যুবা। আহত ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে

অগণন আদিবাসী নর-নারী। অপহৃত কল্পনা চাকমার প্রতি সহমর্মিতায় কবি তাই জুম্ম নারীর বেদনাতপ্ত জীবনের আখ্যান তুলে ধরেছেন :

সবাই তারে বোবা ভাবে।
দুচোখে তার ভরা স্বপন — লুকিয়ে আছে।
কিন্তু নিংরিয়ে নিংরিয়ে পানি ঝরছে কেন?
সেই কবে থেকে ঝরছে — এখনও ঝরা হয়নি
হয়তো পানিও না ওগুলো — রক্ত, তাজা রক্ত।
বুকে তার দুঃখ আছে অসহনীয় ভাবে
পিনোন খাদি ছেঁড়া ছেঁড়া হয়েছে মন
সমস্ত শরীর আঁচড় খাওয়া দাগ তার
এলোমেলো চুল — কত দিন হলো দাঁড়িয়ে আছে
কেউ তারে বলে ভূত, কেউ বলে প্রেত, কেউ বলে পরী —
সবার কাছে রইল সে চির অচেনা
আমি তারে নাম দিয়েছি সে হলো নিশ্চিত
পার্বত্য চট্টগ্রামের হারিয়ে যাওয়া কল্পনা।
(শিশির, ২০০৬গ : ২১২)

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা, পাহাড়ি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন, নির্যাতন, বাঙালি অভিবাসীদের প্রবেশ, ভূমি দখল, সমতল আদিবাসী অঞ্চলে ইকোপার্কের নামে জমিগ্রহণ, বনকর্তন, সর্বোপরি আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের উপর নানামাত্রিক আগ্রাসী থাবা আদিবাসী কবিদের দ্রোহী-সত্তাকে উসকে দিয়েছে। বিভিন্ন নির্যাতনের প্রসঙ্গ-খচিত তাঁদের কবিতার অন্তিমে ঘোষিত হয়েছে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের প্রতিজ্ঞা। রাষ্ট্রীয় হত্যা কারাবাস-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিকে তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন প্রশ্নের মুখে। গণ-ক্ষোভ ও যন্ত্রণার তাপ ধারণ করে আছে সেসব কবিতা :

ক. কিন্তু যেখানে আমার দুইলাখ ভাই-বোন
নিরন্তর শোষিত হয়, লাঞ্ছিত হয় সেখানে
আমি প্রশ্ন তুলবো না কেন?
তুমি বলবে শিরিন নকরেক কেন পাঁচ বছর
কারাগারে রয়েছে? তুমি কি বলবে কেন
বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার-এর কেনা কিছু স্বার্থান্বেষী গোলাম
কোন অপরাধে পঁয়তাল্লিশটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে?
(বাবুল, ২০০৫ : ৬৩)

খ. ধ্বংস করেছো আমার সব ঐতিহ্য, কেড়ে নিয়েছো সব অধিকার
পথচলার গতি রুদ্ধ করেছো
মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দাওনি
... ...
চব্বিশ বছর পাহাড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি, এখনো মুছেনি।
গভীর ঘুমের বিভোরতায়

শোষণের বাঁশি বাজিয়েছো বিষাক্ত সুরে
অন্য জনে এসব নহে
অথচ আমার বেলায়, অপরাধ আদিবাসী?
(শরৎ, ২০০৬ : ৬৪)

গ. আদিবাসী বন কান্দে, বৃক্ষ কান্দে আজ
তোমার লাগি। জেগে উঠো পীরেন স্নাল
আদিবাসী চেতনায়। শোকে নয়, আনন্দ
গৌরবে। খা-সাংমা, খা-মারাক বীর,
বীরত্ব গাঁথা আদিবাসী বিজয় নৃত্যে।
প্রকল্পিত হোক ইকো-পার্ক নয়
শহীদ আদিবাসী পার্ক, মধুপুর বন।
বেজে উঠুক আদিবাসী ঐতিহ্যে নাগ্রা, ক্রাম
আদুরু, দামা, বাংশী, রাং।
নবজাগরণে জেগে উঠুক জয়নাগাছা,
পীরগাছা। জেগে উঠুক আদিবাসী বন।
(মতেন্দ্র, ২০০৫খ : ৩৯)

উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলোতে রাষ্ট্রশক্তির হন্তারক ও নিপীড়ক চেহারা উন্মোচনের মাধ্যমে স্বজাতির সম্মিলিত ক্ষোভপুঞ্জকে কবিরা কবিতায় ধারণ করেছেন। মধুপুরে ইকোপার্ক প্রতিরোধে নিহত পীরেন স্নাল পরিণত হয়েছে সংগ্রামী চেতনায়। কারাবাস-মামলা-হয়রানির রাষ্ট্রীয় আয়োজনের বিপক্ষেও কবিরা কামনা করেছেন আদিবাসী গণজাগরণ।

গনগনে স্পষ্টোচ্চারণে যেমন আদিবাসী কবিরা বিদ্রোহের প্রত্যয় কবিতায় বাঙ্ময় করেছেন, তেমনি প্রতীকী স্বরেও কেউ-কেউ ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। ঔপনিবেশিক শাসকের মতো বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রশক্তির আধিপত্য তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির বিলোপ ডেকে আনছে। এই আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিরা সময়ের পদচিহ্নগুলোতে পুঁতে দিতে চান সংগ্রামের 'লাল গোলাপ' :

ক. আঙুল একটা নয় অনেকগুলো
এটা কেন? সেটা কেন?
আঙ্গুল উঁচিয়ে ধরে আছে
কি করছ? কেন করছ?
বেহুদা — যা ইচ্ছে তাই,
প্রশ্ন আর প্রশ্ন...
এবার সেই আঙ্গুলগুলোকেই
পাল্টা প্রশ্ন আমাদের
কি করব?? কি করা উচিত ???
এখন কেউ নেই...
একটা আঙ্গুল পর্যন্তও... (শ্যাম, ২০০৭ : ১১)

খ. প্রাণের ঝরাপাতা আর মরা বনফুল
নিঃশেষিত প্রাণের স্নিগ্ধ প্রাণবায়ু

ষড়যন্ত্রে ফোটায় কি তবে
প্রাণহীন মুকুল!
এসো, চলো পুঁতে দিই
সময়ের পদচিহ্নগুলোতে লাল গোলাপ
জীবন্ত রাইফেল উঁড়িয়ে। (অভিলাষ, ২০০৮ : ১১২)

স্পষ্ট বা প্রতীকী যেভাবেই উচ্চারিত হোক, আদিবাসী কবিদের অন্তিম লক্ষ্য জাতিগত স্বীকৃতি, শোষণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, নিপীড়নমুক্ত আদিবাসী অঞ্চল আর নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষাও তাই। কবিরা বারবার, অসংখ্য কবিতায় জাতির এই মর্ম-দাবিকে কবিতায় গেঁথে চলেছেন। নিম্নোক্ত কাব্যাংশগুলো সেই অগণিত কবিতার সারবস্তুকেই উপস্থাপন করে :

ক. আমি কোন অচিন গ্রহালোকের মানুষ নই।
চারপাশে পরিচিত সমাজ, সংসার, জীবন
পাহাড়, নদী, বন, প্রকৃতি, গ্রহ, নক্ষত্র।
মাটি স্নেহে লালিত; এদেশেরই ভূমিজ সন্তান।
মঙ্গোলীয় রক্তধারা আমার শরীরে, আমি
আদিবাসী গারো।
আমার অস্তিত্ব, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যতই অস্বীকার
করো, আমাকে নিয়ে যতই হাসাহাসি করো
সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতেই হবে একদিন।
(মতেন্দ্র, ২০০৫গ : ৩৪)

খ. নেরা নিয়া নূরু নিয়া
ডিডা নিয়া ভিটা নিয়া
হায়রে-হায়রে! মাপাক্ গপচ্ দো।
নুরি নাঁড়াড় গাই কাডা, নাচেল লাগিৎ পাচের লাগিৎ,
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্রাম রুওয়াড় লাগিৎ,
তবে দো বোন হুল গেয়াহো।
বঙ্গানুবাদ :
স্ত্রী পুত্রের জন্য,
জমি জায়গা, বাস্তুভিটার জন্য,
গো-মহিষ, লাঙ্গল, ধন-সম্পদের জন্য,
পূর্বের মতো আবার সব ফিরে পাবার জন্য,
আমরা বিদ্রোহ করবো।
(অজ্ঞাতনামা কবি, ২০০৬ : ১৯)

গ. কোথায় আশীর্বাদ চাইবো, ভেঙে গেছে প্রার্থনার ঘর
হৃদয়ের প্রেরণা কোথায় গিয়ে পাবো, জড়িয়ে আছে হাতে পায়ে শৃঙ্খল
চোখের সামনে ঝুলছে শৃঙ্খলের পর্বত।
আমি কবুল করেছি এ বিঝুতে আমি যাবো না

আমার অর্ধ লক্ষ মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজনের প্রেক্ষিতে,
আমি উপবাসী হয়ে থাকবো, পাহাড় পর্বতের ক্রন্দনের প্রেক্ষিতে,
আমি উপবাসী হয়ে থাকবো, যাদের রক্ত বয়ে যাওয়ার পেছনে।
(মৃত্তিকা, ২০০৬খ : ৮৯)

৪

বাংলাদেশের আদিবাসী কবিতার উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ঔপনিবেশিক চারিত্র্যের বিরুদ্ধে কবিরা সোচ্চার। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাঙালিসহ ভারতীয় অন্য জাতিগোষ্ঠী যেমন নিপীড়ন-নিস্পেষণের শিকার হয়েছিল, বর্তমানে বাংলাদেশের আদিবাসীরাও সেই প্রান্তিকীকরণের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় জারিত। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পেলেও ব্রিটিশসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আরোহণ করে। ফলে, 'রক্তে-মাংসে ভারতীয় কিন্তু মগজে-মননে ইংরেজ' তুল্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঔপনিবেশিক কাঠামোকেই এখনো পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের করতল থেকে মুক্ত হলে কী হবে, বাংলাদেশের অবস্থাও অনুরূপ। ফলে ইংরেজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী ধারণায় বাঙালি জাতিও বাংলাদেশের অন্য জাতিসত্তাকে চিহ্নিত করে 'অপর' সত্তারূপে। জাতিগত এই নিপীড়ন ব্রিটিশ ও নেটিভদের সম্পর্কের মাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে সামরিক বাহিনীর প্রবেশ, সেখানকার বনভূমি কেটে উজার, ইকোপার্ক স্থাপন, পর্যটন কেন্দ্র খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের আদিবাসী হয়েও আদিবাসীরা 'পরবাসী'র গ্লানি নিয়ে বেড়ে উঠছে। আদিবাসী কবিদের কবিতায়ও তাই উপনিবেশ-বিরোধী চৈতন্য বিকশিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আধিপত্যপ্রবণ ভূমিকা ও রাষ্ট্রীয় সকল নিপীড়নের প্রতিরোধে। পাশাপাশি, নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও আদিবাসী কবিরা সচেতন ও সোচ্চার। বস্তুত, প্রতিরোধী ও সংগ্রামী এসব উচ্চারণে আদিবাসীদের নির্যাতিত অভিজ্ঞতা যেমন মুদ্রিত, তেমনি পরিত্রাণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবিও বাঙ্ময়।

সহায়কপঞ্জি

কবিতাপঞ্জি

অজ্ঞাতনামা কবি (২০০৬)। উদ্ধৃত : সঞ্জীব দ্রং, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস ও আজকের আদিবাসী সমাজ'; *হুল* [সম্পাদক : পাভেল পার্থ ও অন্যান্য], ঢাকা।

অভিলাষ চাকমা (২০০৮)। 'দ্রোহ'; *জুম* [সম্পাদক : পল্লব চাকমা], জুম লিটারেচার ইয়ং সোসাইটি, ঢাকা।

অরণ্য চিরান (২০০৫)। 'অশান্ত শালছায়া'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

আন্ধারী বালা (১৯৯১)। উদ্ধৃত : মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

এ কে শেরাম (২০০১)। 'লোনগী অরাবা' (ভাষা); *বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা* [সম্পাদক : এ কে শেরাম], বাংলাদেশ মনিপুরী সাহিত্য সংসদ, সিলেট।

কবিতা চাকমা (২০১৩)। 'জ্বলি ন' উধিম কিত্তেই'; *বাংলাদেশের আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ* [সম্পাদনা : হিমেল বরকত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জগৎ জ্যোতি চাক্‌মা (২০০৬)। 'দ্রোহ'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

জড়িতা চাকমা (২০০৫)। 'জ্বলে নারী, মানুষ হয়ে'; *জাগরণ* [সম্পাদক : কল্পনা চাকমা ও অন্যান্য], হিল উইমেন্স ফেডারেশন, চট্টগ্রাম।

জেমস জর্নেশ চিরান (২০০৫) ক। 'জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

(২০০৫) খ। 'আমি ও আমার রক্ত'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

জোয়াল গেলম্যান (২০০৭)। 'ইতিহাস' (অনুবাদ : মুহম্মদ নূরুল হুদা); *তৃতীয় বিশ্বের কবিতা* [সম্পাদক : সোহরাব হাসান], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

তপন ত্রিপুরা (১৩৯৯)। 'ডায়েরীর শব্দ'; *ইয়াপ্রি-তিন* [সম্পাদক : মলয় ত্রিপুরা], ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন, রাঙামাটি।

তরুণ কুমার চাক্‌মা (২০০৬)। 'কোন সমুদ্রে' (অনুবাদ : মৃত্তিকা চাকমা); *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

ত্রিজিনাদ চাঙমা (২০০৬)। 'উন্নয়ন ষড়যন্ত্র'; *রান্যাফুল* (চাঙমা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

দিনাই লাকড়া (১৯৯১)। উদ্ধৃত : মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৮৯)। 'ডিসেম্বর ১৯৮১'; *রাজনৈতিক কবিতা*, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা।

নীলু জর্জ রুরাম (২০০৫) ক। 'ঈশ্বরের মানুষ'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

(২০০৫) খ। 'রক্তিমাভা সূর্যটি'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

পদ্মলোচন চাক্‌মা (২০০৬)। 'ছন্নছাড়া' (অনুবাদ : শরৎ); *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা] , প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

পরমেশ্বর চাকমা (২০০৫)। 'সলঙ' (বর্ণচোর); *মাওরুম* [সম্পাদক : দীপায়ন খীসা ও পল্লব চাকমা], ঢাকা।

বচন নকরেক (২০০৫) ক। 'দিগ্বিদিক উড়ে উদ্ভট বাদুর'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

(২০০৫) খ। 'নিঃসঙ্গ সালজং'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পা. বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

বাবুল ডি নকরেক (২০০৫)। 'অনাহূত অতিথি'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

বারেন্দ্র লাল চাক্‌মা (২০০৬)। 'ঝিঙেফুল ফুটিবে না আর'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

বি. এফ রংদী (২০০৭)। 'বিপন্ন আমি'; *ছাদাম্বে* [সম্পাদক : সুহাস চিরান], গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ।

বীর কুমার চাক্‌মা (২০০৬)। 'সবুজ পাহাড়ের গেরস্থালী'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

মতেন্দ্র মানখিন (২০০৫ ক)। 'একটি নমস্কার'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

(২০০৫ খ)। 'সময়ের পদাবলী'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

(২০০৫ গ)। 'জেগে উঠুক আদিবাসী বন'; *জ্যোৎস্না নেই পূর্ণিমা নেই* (এগারজন গারো কবির কবিতা সংকলন) [সম্পাদক : বাবুল নকরেক], । প্রকাশক : রঞ্জিত রুগা, ঢাকা।

মিলি মেরী মৃ (২০০৬)। 'এ কিসের আর্তনাদ'; *আদিকণ্ঠ* [সম্পাদক : দীপঙ্কর রিছিল], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মৃত্তিকা চাকমা (২০০৬ ক)। 'গাঙর নাঙ লোগাঙ' [অনুবাদ : শরৎ]; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

(২০০৬ খ)। 'হৃদয়ে পাহাড় কাঁদে', *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

লেবিসন স্কু (২০০৭)। 'সোমেশ্বরী'; *ওয়ান্না* [সম্পাদক : মিঠুন রাকসাম], ঢাকা।

শরৎ জ্যোতি চাকমা (২০০৬)। 'ঘুমিয়ে রেখেছো হাজার বছর ধরে'; *হুল* [সম্পাদক : পাভেল পার্থ ও অন্যান্য], ঢাকা।

(২০০৮)। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ লার্মা তুমি একবার এসে দেখে যাও'; *জুম* [সম্পাদক : পল্লব চাকমা], জুম লিটারেচার ইয়ং সোসাইটি, ঢাকা।

শিশির চাক্‌মা (২০০৬ ক)। 'আমার প্রাণের বর্ণমালা'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

(২০০৬ খ)। 'নীলাম্বর গেংখুলী'। *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

(২০০৬ গ)। 'তার অপেক্ষায়'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

শুভজিৎ ঘাগ্রা (২০০৭)। 'অনাহুত'; *ওয়ান্না* [সম্পাদক : মিঠুন রাকসাম] ঢাকা।

শ্যাম (২০০৭)। *ছাদাম্বে* [সম্পাদক : সুহাস চিরান], গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ।

শ্যামল তালুকদার (২০০৬)। 'অবাধ্য হওয়ার মতো'; *রান্যাফুল* (চাঙ্‌মা শ্রেষ্ঠ কবিতা) [সম্পাদক : হেমল দেওয়ান, শরৎ জ্যোতি চাক্‌মা, হিরন মিত্র চাকমা ও পল্লব চাক্‌মা], প্রকাশক : মনি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা।

সুহৃদ চাকমা (১৯৮৭)। 'নিশুতিরাতে সবুজ-স্বপ্নের আত্মহনন'; *বাগী*, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল, রাঙামাটি।

সৌ সুবীর জেভিয়ার মারাক (২০০৭)। 'আদিবাসী মেয়েটি'; *ছাদাম্বে* [সম্পাদক : সুহাস চিরান], গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ।

স্বপন এক্কা (২০১৩)। 'ভবঘুরে'; *বাংলাদেশের আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ* [সম্পাদক : হিমেল বরকত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

প্রবন্ধপঞ্জি

আমেনা আখতার মোহসীন (১৯৯৯)। 'সাংস্কৃতিক সংঘাত ও পাহাড়ী-বাঙালী সম্পর্ক'; *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সংকট ও সম্ভাবনা*, [সম্পাদক : মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা], গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা।

এমে সেজের (২০১০)। 'উপনিবেশ ব্যবসায়ের কাহিনি' [অনুবাদ : সলিমুল্লাহ খান]; *ডেসটিনি*, সম্পাদক : মোহাম্মদ রফিকুল আমিন, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা।

ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরীন (২০০৯)। 'ইতিহাস নির্মাণের সংস্কৃতি'; *বিপন্ন ভূমিজ* [সম্পাদক : মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া]। অ্যাডর্ন, ঢাকা।

কবিতা চাকমা, সামারী চাকমা ও ইলিরা দেওয়ান (২০০১)। 'ভূমিকা'; *কল্পনা চাকমার ডায়েরী*, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা।

কামনাশীষ শেখর (২০০৭)। 'হারিয়ে যাচ্ছে গারোদের মাতৃভাষা আচিক'; *আদিবাসী প্রবন্ধ সংকলন*। ইন্ডিজিনাস পিপলস রাইটারস ফোরাম, ঢাকা।

গোলাম মোর্তোজা (২০১০)। 'কার ইশারায় পাহাড় কাঁপে?'। *সাপ্তাহিক* [সম্পাদক : গোলাম মোর্তোজা], ৪ মার্চ ২০১০, ঢাকা।

জয়নাল আবেদীন (১৯৯৭)। 'আমার কথা'; *পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বরূপ সন্ধান*। বুক মিউজিয়াম, ঢাকা।

জোবাইদা নাসরীন (২০০৯)। 'বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর ত্রিমুখী প্রান্তিকতা'; *বিপন্ন ভূমিজ* [সম্পাদক : মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া], অ্যাডর্ন, ঢাকা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০৭)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*; নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (২০১০)। *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড* [ভাষান্তর : দুলাল আল মনসুর]; সংবেদ, ঢাকা।

নোমান চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম ও প্রদীপ চৌধুরী (২০০৯)। 'হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি সংস্কৃতি'; *সাপ্তাহিক ২০০০*, বর্ষ ১২ সংখ্যা ২১, ঢাকা।

পাভেল পার্থ (২০০৭)। 'মধুপুর জাতীয় উদ্যান : রাষ্ট্রের জাত্যাভিমান বনাম নিম্নবর্গের দ্রোহ'; *আদিবাসী প্রবন্ধ সংকলন*, ইন্ডিজিনাস পিপলস রাইটারস ফোরাম, ঢাকা।

প্রদীপ্ত খীসা (১৯৯৬)। 'সমস্যার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'; *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

ফকরুল চৌধুরী (২০০৭)। 'ভূমিকা'; *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* [সম্পাদক : ফকরুল চৌধুরী], র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

ফিলিপ গাইন (২০০৪ ক)। 'ভূমিকা'; *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবনসংগ্রাম* [সম্পাদক : ফিলিপ গাইন], সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

(২০০৪ খ)। 'বন, বনবিনাশ এবং বনভূমিতে বিদেশী প্রজাতির আগ্রাসন'; *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবনসংগ্রাম* [সম্পা. ফিলিপ গাইন], সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

ফ্রাঞ্জ ফানো (২০০৬) । *জগতের লাঞ্ছিত* [আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনূদিত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বিপ্লব কুমার চাকমা (১৯৯৭)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

বীরকুমার তংচঙ্গ্যা (২০০৩)। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন বারবার ইতিহাসের নির্মম পরিহাসের বলি হবে?'; *আমাং*। জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল, রাঙামাটি পার্বত্য অঞ্চল।

মঙ্গল কুমার চাকমা (২০০৯)। 'আদিবাসী জনগণ ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থা'; *বিপন্ন ভূমিজ* [সম্পাদক : মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া], অ্যাডর্ন, ঢাকা।

মাহমুদুল হাসান সুমন ও সাঈদ ফেরদৌস (২০০৯)। 'ইন্ডিজেনাস'-এর অনুসন্ধান : বাংলাদেশের বিদ্যায়তনিক জগতের দোনোমনা'; *বিপন্ন ভূমিজ* [সম্পাদনা : মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া], অ্যাডর্ন, ঢাকা।

মাথুরা ত্রিপুরা (১৯৯৮)। 'আরাং আনি এমাং'; *রাকা-৯৮* [সম্পাদক : সুখেশ্বর চাকমা পল্টু]। জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, রাঙামাটি।

মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত (১৯৯৯)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা।

সঞ্জীব দ্রং (২০০৪)। *গণতন্ত্র সুশাসন ও বাংলাদেশের আদিবাসী*, সূচীপত্র, ঢাকা।

সাপ্তাহিক ২০০০ (২০১১)। 'আদিবাসীদের ভাষা পুনরুদ্ধারে অস্ট্রেলিয়া'। বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১৮, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১, সম্পাদক : মঈনুল আহসান সাবের, ঢাকা।

সিলভানুস লামিন (২০০২)। 'একটি অসত্য (!) কাহিনী ও খাসিয়া সম্প্রদায়'; *হূল*, ঢাকা।

সুগম চাকমা (২০০৯)। 'প্রসঙ্গ : কাপ্তাই বাঁধ'; *সুলাই-প*, [সম্পাদনা : রিপন চাঙমা], জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙামাটি।

সৃজন সাংমা (২০০১)। 'অনক্ষর গারো সমাজে সংস্কৃতি সংরক্ষণে নকপান্থের ভূমিকা'; *বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০০১*, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, নেত্রকোণা।

Frantz Fanon (1967). *Black Skin White Masks* [translated by Charles Lam Markmann], Grove Press, New York.